হাতে খড়ি

প্রথম সংখ্যা · ১৪২৮

সত্য-মিত্র স্মরণে

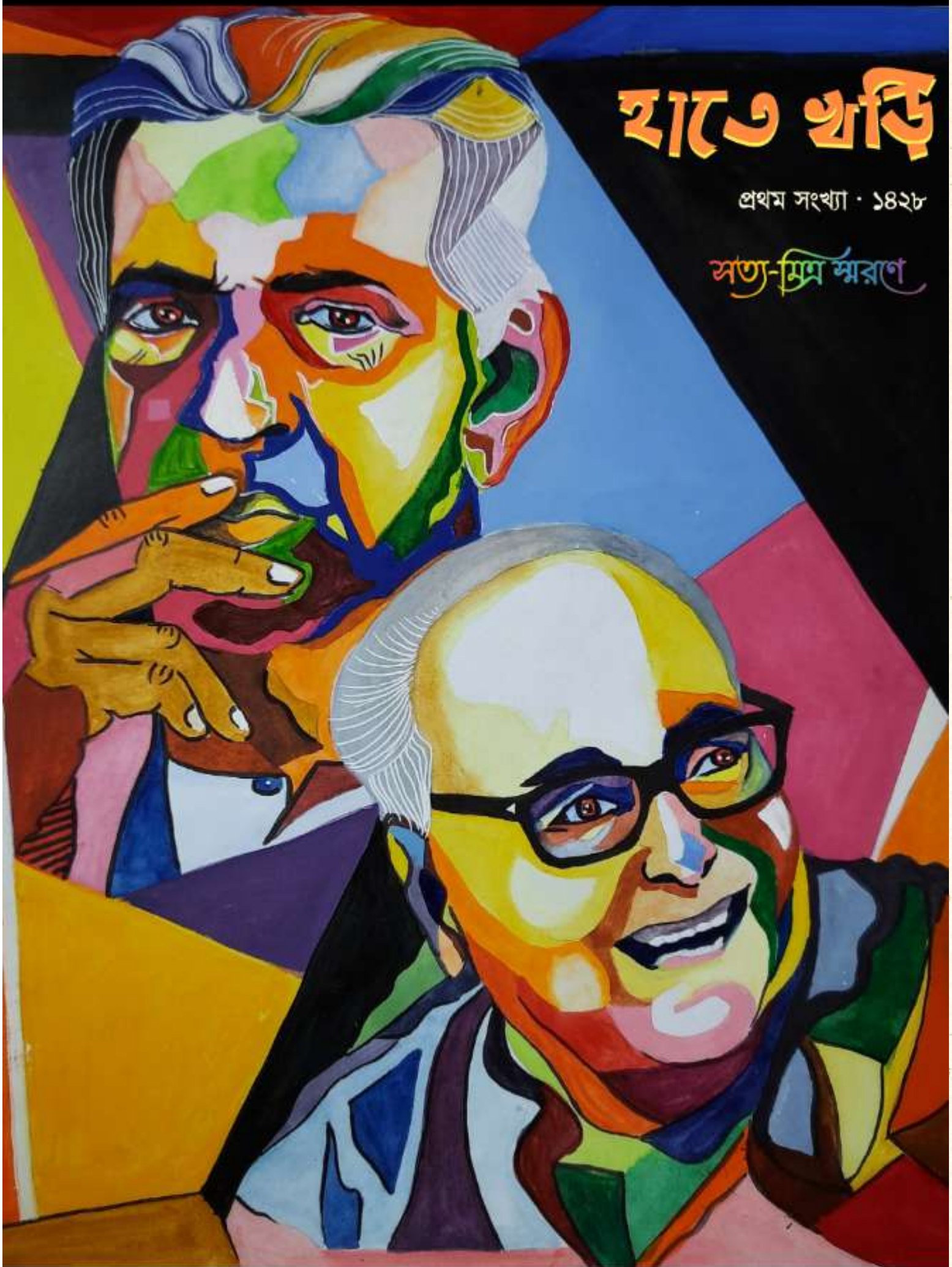

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন : বাংলা বিভাগ

• হাতে খড়ি •

প্রথম সংখ্যা • ১৪২৮

প্রকাশ : ২৯ শে জুন ২০২১

সম্পাদক

অঙ্কিতা রায়

(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সহ সম্পাদক

প্রীতিষা মাইতি

(চতুর্থ সেমিস্টার)

প্রচ্ছদ নির্মাণে

প্রিয়াঙ্কা পাল

(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

অলঙ্করণে

প্রীতিষা মাইতি

(চতুর্থ সেমিস্টার)

তৃষা চক্রবর্তী

(দ্বিতীয় সেমিস্টার)

সমগ্র ফটোকোলাজ নির্মাণে

অঙ্কিতা রায়

(ষষ্ঠ সেমিস্টার)

সম্পাদকীয়

সম্পাদিকার কলমে

বর্তমানে অতিমারীর কবলে আক্রান্ত সারা বিশ্ব। স্কুল - কলেজ - বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। চারিদিকে শুধুই হতাশা আর মন খারাপ। কবে সবটা স্বাভাবিক হবে কেউ জানেনা। এই অতিমারীর চোখরাঙানি এবং ঘরবন্দী দশা ব্যাঘাত ঘটিয়েছে জীবনযাত্রার রোজনামচায়, তবুও এই একরাশ মনখারাপ ও থিতিয়ে পড়া ইচ্ছেশক্তির মধ্যে থেকেও খুঁজে নিতে হয় ভালো থাকার রসদ। বর্তমানের জটিল পরিস্থিতির একমাত্র মাধ্যমই যখন অনলাইন ও মুঠোফোন তাই তারই মাধ্যমে এক ভিন্ন স্বাদ পেতে আমাদের 'বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন' এর 'বাংলা বিভাগ' এর "হাতে খড়ি" বৈদ্যুতিন পরিসরে।

গতানুগতিক পড়াশোনার বাইরে নিজের ভাবনাগুলোকে নিজেদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে তুলে ধরতে পারবে কলেজের ছাত্রীরা। বলতে গেলে ছোটদের প্রথম লেখা যেমন একেবারেই আঁকাবাঁকা হরফে কাগজে ফুটে ওঠে, ঠিক তেমনই এই পত্রিকা যেহেতু আমাদের প্রথম সংখ্যা ও প্রথম প্রচেষ্টা, তাই আমাদের পত্রিকারও লেখা ও অন্যান্য কাজগুলো অপরিণত হতেই পারে ও তার মধ্যে ভুল - ত্রুটি থাকবেই। পরবর্তীকালে তাকে পরিণত ও উচ্চ আঙ্গিকে স্থাপনের অঙ্গীকার নিলাম। দুই কিংবদন্তি সত্যজিৎ রায়ের জন্ম শতবর্ষ ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর প্রয়াণ - এই দুই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতেই একফ্রেমে এঁদের ধরতে চেয়েছি আমরা। আর তাই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা এই দুই বরেণ্য শিল্পী কে নিয়েই,প্রধানত। আমাদের মতো করেই সত্যজিৎ রায় এবং সৌমিত্র চট্টপাধ্যায় এর যুগলবন্দী নির্মাণ করলাম। আপনাদের সকলকে একান্ত অনুরোধ করছি,আমাদের প্রয়াসের ত্রুটির দিকগুলি জানাবেন,ভালো লাগলেও জানাবেন। আমরা কাজ করতে চাই,সৃষ্টি করতে চাই। ভুল অনেক হবে,তার মধ্যে দিয়েই শিখবও অনেক।এই আমাদের একান্ত

চাওয়া।

সবশেষে সম্মাননীয়া অধ্যক্ষা মহাশয়া ও আমার বিভাগীয় সকল অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকাদের জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা, যাঁদের উৎসাহ প্রাণিত করেছে আমাদের। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই অধ্যাপিকা ড.পিয়ালী দত্ত চৌধুরী মহাশয়া কে যার সাহচর্যে আমরা পত্রিকা প্রকাশে ব্রতী হয়েছি , এছাড়া পত্রিকার সহ - সম্পাদককেও নানান ভাবে পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ না জানিয়ে অনেকটা ভালোবাসা জানালাম। আর অবশ্যই আমার সহপাঠীদের এবং কনিষ্ঠাদেরকেও অনেক স্নেহ ও ভালোবাসা জানাই তাদের অমূল্য কাজগুলি দিয়ে আমাদের পত্রিকাটির পাশে থাকার জন্য। আর পাঠকবৃন্দকেও জানাই ধন্যবাদ। কারণ, পাঠক ব্যতীত পত্রিকা মূল্যহীন।সকলে পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন।

সকলের শুভকামনাই আমাদের একান্ত কাম্য।

- ধন্যবাদান্তে

অঙ্কিতা রায় - ষষ্ঠ সেমিস্টার

বাংলা বিভাগ

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

শুভেচ্ছা বার্তা

বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন এর বাংলা বিভাগের উদ্যোগে প্রকাশিত হতে চলেছে ই - পত্রিকা 'হাতেখড়ি' প্রথম সংস্করণ - ১৪২৮ এর প্রচেষ্টা অভিনব ও সময়োপযোগী। বর্তমানে অনলাইন পঠনপাঠনের মাধ্যমেই চলেছে শিক্ষাব্যবস্থার বিশাল কর্মকাণ্ড। এই পরিস্থিতিতে তোমাদের প্রচেষ্টাকে সর্বান্তকরণে স্বাগত জানাই। তোমাদের এই কাজে আমি আন্তরিকভাবে উৎসাহ প্রদান করছি। যারা এই কাজে ব্রতী হয়েছ তাদের সাফল্য কামনা করি। এই প্রয়াসে কলেজ তোমাদের যথাসাধ্য সহায়তা করবে। তোমাদের এই উদ্যোগে এই পত্রিকার প্রকাশনার কাজে তোমাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা, আশীর্বাদ ও ভালোবাসা জানাই। ভবিষ্যতে এই পত্রিকার আরও প্রসার হোক এবং সমগ্র কলেজের অন্যতম একটি পত্রিকায় পরিণত হোক এই আশীর্বাদ জানাই।

—শ্রী দেবাশিস মল্লিক

কলেজ পরিচালনা সমিতির প্রেসিডেন্ট, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

প্রিয় পাঠক,

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগের ছাত্রীরা একটি সুন্দর ওয়েব পত্রিকা প্রকাশ করতে চলেছে।করোনা পরিস্থিতিতে চিরাচরিত দেওয়াল পত্রিকার পরিবর্তে ওদের এই অভিনব ওয়েব পত্রিকার পরিকল্পনাকে সাধুবাদ জানাই। বিভাগের শিক্ষকদেরও সাধুবাদ জানাই ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টায় তাদের পাশে থাকার জন্য, নেপথ্যে থেকে তাদের পড়াশুনার পাশাপাশি মৌলিক চিন্তাচর্চা কর্মে অনুপ্রাণিত করার জন্য। ছাত্রীদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হোক, সর্বান্তকরণে এই শুভকামনা করি। পরিশেষে সকলের সুস্থতার, রোগমুক্ত আগামীর কামনা করি।

—ডঃ রূপালি চৌধুরী

অধ্যক্ষা, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

শুভেচ্ছা বার্তা

আমাদের কলেজের বাংলা বিভাগের ছাত্রীরা "হাতে খড়ি"নামক যে ই পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছে আমি আই কিউ এ সির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।বর্তমান পরিস্থিতিতে ছাত্রীরা একাকিত্ব কাটিয়ে লেখনীর মাধ্যমে তাদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা করছে এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে তাদের এই প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস ।এটা হয়ত তাদের হাতে খড়ি অর্থাৎ লেখার প্রথম প্রয়াস।কিন্তু এর মধ্য দিয়ে উত্তরোত্তর তাদের লেখার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা রয়েছে তা প্রস্ফুটিত হবে।আমার আশা এদের মধ্য থেকে ভবিষ্যতে কোন স্বনামধন্য কবি, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক লাভ করবে বাংলা সমাজ" ও সাহিত্য ।সব শেষে আমি "হাতে খড়ি"র সাফল্য কামনা করছি।

—ডঃ তপন রায়

আই কিউ এ সি কোঅর্ডিনেটর, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

আনন্দ সংবাদ! আমাদের বাংলা বিভাগের সান্মানিক ছাত্রীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আজ ই-পত্রিকা 'হাতেখড়ি' প্রকাশিত হতে চলেছে। এটা তাদেরই পরিশ্রমের ফল। আমি মনে করি প্রত্যেকের মধ্যেই প্রতিভা সুপ্ত থাকে। তাকে শুধু একটু জাগিয়ে তুলতে হয়। তাদের ইচ্ছা আর প্রচেষ্টায় আজ নতুন রঙ লেগেছে। আশাকরি এই পত্রিকা আগামীদিনে আরো সমৃদ্ধ হবে। ওদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

—ড: নন্দা মল্লিক

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

তোমাদের এই পত্রিকা রচনার প্রয়াসকে আমি সমর্থন জানাই । নানারকমের সুবিধা অসুবিধার মধ্যে তোমাদের এই চলাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি - " শুভ কর্ম পথে ধরো নির্ভয় গান"

—ড. অজন্তা মিত্র

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

শুভেচ্ছা বার্তা

"বীজ রোপণ করে দিলাম, চারা গাছের বৃদ্ধি দেখব বলে।আমার প্রিয় মালিদের 'হাতে খড়ি' চারা গাছকে একদিন মহীরূহে পরিণত করবে। করবেই..."

—ড: পিয়ালী দত্ত চৌধুরী

বিভাগীয় প্রধান

অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

সারাবিশ্ব আজ এক অতিমারী ও মারণ রোগের ত্রাসে ভুগছে। প্রতিদিন বহুক্ষেত্রে নানান পরিবর্তন ও বিপর্যয় নেমে আসছে। অন্যান্যদের মতো সাহিত্যপ্রেমিরাও বাদ যাচ্ছে না তার ছোবল থেকে। এই অবস্থায় একেবারে সময়োপোযোগী পদক্ষেপ নিয়েছ তোমরা। আশাকরি তোমাদের চিন্তা ভাবনা ই-পত্রিকা 'হাতে খড়ি'র মাধ্যমে দ্রুত পাঠক-শ্রোতার কাছে পৌঁছে যাবে। তোমাদের এই ব্রত বিভাগের গণ্ডি পেরিয়ে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ুক এই শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ তোমাদের জন্য রইল।

—গণেশ হেমব্রম,

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

দীর্ঘদিন সব বন্ধ, মোলাকাত হচ্ছে ভার্চুয়াল মাধ্যমে। ভার্চুয়াল মাধ্যমকে ব্যবহার করে 'হাতে খড়ি' বেরুচ্ছে। ঐটুকু তো এখন সম্বল আমাদের। একটাই কথা বলার, এই আকালেও আমরা যেন স্বপ্ন দেখতে পারি।

—অনল পাল,

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বিদ্যাসাগর কলেজ ফর উইমেন

সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে

• সূচিপত্র •

প্রবন্ধ

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনার জুটি : সৌমিত্র - সত্যজিৎ — স্নেহা গাঙ্গুলি 5 .

আমার সত্যজিৎ — পৌষালী চক্রবর্তী 7 .

সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একত্রিত সৃষ্টি — মনীষা সামন্ত 9 .

অনুভূতিতে সত্য-মিত্র — তৃষা চক্রবর্তী 12 .

চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ- সৌমিত্র মিলন — অনুসীমা মাঝি 14 .

ছোটদের ছবিতে সত্য-মিত্র — প্রীতিষা মাইতি 17 .

ছোটগল্প

অন্ধকার — প্রীতিষা মাইতি 21 .

ভালোবাসা — মন্দিরা বসাক 23 .

রামধনুর দু'টি রং" — দেবীকা সাহা 25 .

রমেশবাবুর রহস্যভেদ — সায়ন্তিকা দাস 31 .

অনুগল্প

মা — পিয়ালী দাস 34

ফিরে পাওয়া — সুলগ্না দে 36

আত্মীয় — পিয়ালী দাস 37

কবিতা

নিজের মত — তৃষা চক্রবর্তী 40

তোমার ভাবে — প্রীতিষা মাইতি 41

জন্মভূমি — ঐশী সিংহ 43

তুমি তো সেই সুন্দরী — সুলগ্না দে 44

যুগলবন্দি — মন্দিরা বসাক 45

সত্য - জিতে বাঙালী — সাবনাম সেরিন 47

প্রবন্ধ

বাংলা চলচ্চিত্রের সোনার জুটি

সৌমিত্র - সত্যজিৎ

অপুর সংসার শুটিং-এর সময় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায় : সোনার জুটির পথ চলা শুরু

আজ যে দুটো মানুষের কথা বলতে চলেছি, তাদের মধ্যে একজন মহারাজা আর একজন তাঁরই সুযোগ্য সহযোদ্ধা বলা চলে ।আপামোর বাঙালির সেরা জুটি সৌমিত্র-সত্যজিৎ। শুনে অবাক হচ্ছেন নিশ্চয় সেরা জুটি তো নায়ক- নায়িকার হয় এদের সেরা জুটি বলছি কেন, কারণ পরিচালকের সঙ্গে অভিনেতার এমন সখ্য আর কোথাও দেখা যায় না । অপরাজিত (১৯৫৬) ছবির সময় অপুর খোঁজ চালাচ্ছিলেন সত্যজিৎ, সেই সময় সৌমিত্র র সঙ্গে প্রথম আলাপ, সত্যজিৎ বলেছিলেন-"এহে আপনি তো বড্ড বড়ো হয়ে গেলেন ।" তবে সেদিনই ট্রিলজির প্ল্যানিংটা সেরে ফেলেছিলেন তিনি, তা টের পায়নি সৌমিত্র। অপুর সংসার (১৯৬৪) এর সঙ্গেই শুরু এই জুটির পথচলা । ছয় ফুট লম্বা, ফর্সা, ছিপছিপে, চেহারার অভিনয় পাগল ছেলেটাকেই নিজের অপু হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন বিশ্ববরেণ্য এই পরিচালক। চারুলতা (১৯৬৪) ছবি ছিল এই জুটির

অন্যতম মাইলস্টোন। এই ছবির সময় প্রাক - রাবীন্দ্রীক হাতের লেখা শিখিয়ে নিজে হাতে গড়ে তুলেছিলেন অমলকে । অপু ও অমল বাদে এই জুটি একসঙ্গে কাজ করেছে প্রায় ১৪ টি ছবিতে, সৌমিত্রের দেহাকৃতির ওপর ভিত্তি করে ফেলুদার কিছু ইলাস্ট্রেশন তৈরি করেছিলেন সত্যজিৎ। এককথায় সত্যজিৎ মনের মতো করে গড়ে নিচ্ছিলেন সৌমিত্রকে , গড়ে তোলা মানে শিক্ষকের মতো পাঠদান নয়, কাজের ভেতর দিয়ে, বন্ধুত্বের আবহে। "মানিক বাবু" আর "আপনি" সম্বোধন ঘুচে গিয়ে তা "মানিক দা " আর"তুমি" তে পরিণতি পায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় 'মানিকদার সঙ্গ' নামে একটি বই ও লেখেন সত্যজিৎ রায়- কে নিয়ে (The Master and I)। ১৯৭৪ সালে এই সোনার জুটি তৈরি করে 'সোনার কেল্লা ' । সত্যজিৎ চাইতেন তুন গল্প বলতে , নতুন নতুন চরিত্রর সমাবেশ ঘটাতে,এই চাওয়াকে সার্থক করতে সৌমিত্র নিজেকে বিনির্মাণের ভেতর দিয়ে উজার করে দিয়েছিল । বলা বাহুল্য, অভিনেতা হিসাবে নিজেকে সঁপে দেওয়ার কাজটি করেছিলেন সৌমিত্র, সত্যজিৎ এর কাছে। এই জুটির কাজ তাই এখন কালকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে পাঠযোগ্য চলচ্চিত্র । এই সোনার জুটি বাংলা তথা বিশ্বচলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। যতদিন বাঙালি থাকবে, বাংলা চলচ্চিত্র থাকবে ততদিন মহারাজা ও তাঁর এই সুযোগ্য সহযোদ্ধাকে সেলাম জানাবে বাঙালি। পরিচালক ও অভিনেতার এমন যুগলবন্দী বাঙালি সিনেমা প্রেমিকেদের মননে সর্বাধিক সমাদৃত ও উদ্ধৃত হয় থাকবে চিরকাল।

স্নেহা গাঙ্গুলি, ষষ্ঠ সেমিস্টার

ঐশী সিংহ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

আমার সত্যজিৎ

মানিক বাবুর চলচ্চিত্রগুলি পুরনো অরিষ্টের মতোন যা সময়ের সাথে আরও মেজাজী হয়। লুকিয়ে লুকিয়ে কেবল জীবনের অংশই সেলুলয়েডে ঢেলে দেননি তিনি, বারংবার প্রমাণ করেছেন কোনো একটি পরিস্কার অর্থ তাঁর কোনো চলচ্চিত্রতেই নেই। এক একটি 'আমি'-র প্রকাশ ঘটেছে তাঁর এক একটি ছবিতে।

"...বক্স অফিস সম্বন্ধে যে প্রচলিত ধারণাগুলি আছে আমার ধারণাটা তার থেকে তফাৎ ছিল।" আর এই ধারণাই সম্ভবত 'পথের পাঁচালী'-তে তোবড়ানো এক ঘটি ব্যবহারেও দ্বিধাবোধ করেনি, তৈরী করেছে কাব্যিক 'চারুলতা', মানসিক ভাবে সমৃদ্ধ 'নায়ক'-কে, তৈরী করেছে 'গুপী-বাঘা'-র মতোন ম্যাজিকাল বন্ধুত্বের জুটি, ইত্যাদি। যদিও সাধারন দর্শকের কাছে তা দর্শনযোগ্য করে তোলে 'অ্যাকাডেমী ফিল্ম আরকাইভ', ১৬ মিমি. মুদ্রণ হিসেবে নিবেদিত করে।

বলা হয় সিনেমা হল-এর পঁচাত্তর শতাংশ মানুষকে নিয়ে ভেবেছিলেন সত্যজিৎ রায়, যারা ভাষার ভার বোঝেন না, বোঝেন না জীবনের কঠিন মানে, যারা শুধু বোঝেন সহজ সরল একই সুরে গাওয়া, একই পথে চলা জীবনপথ-এর পাঁচালী। তবে কি 'প্রদোষ চন্দ্র মিত্তির' শিক্ষিত, চিন্তাশীল বাঙালীর রুপক নাকি সেই পঁচাত্তর শতাংশ সহজ সরল রসিক

বাঙালীর বাড়ির ছেলে 'ফেলু'? 'হীরক রাজার দেশে' কি তবে শুধুই সাধারন মানুষকে দুনিয়ার রঙ্গ দেখায় নাকি 'উদয়ন পন্ডিত'-এর মতোন ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষকের মূল্যবোধও বোঝায়?

সত্যজিৎ রায় আলোচনা প্রসঙ্গে যাঁর নাম স্বাভাবিক ভাবেই জড়িয়ে পড়ে তিনি আর কেউ নন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বাঙালীর 'অপু' এবং 'ফেলু'/'ফেলুদা'।

সত্যজিৎ রায়-এর মতোন চিত্রনির্মাতা অনায়াস প্রয়াসেই 'অপু' ও 'ফেলু'/'ফেলুদা' এই দুই চরিত্রে দুই পৃথক ব্যক্তির প্রচ্ছদ অঙ্কন করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে স্নেহের পুলু -কেই বেছে নিয়েছিলেন এই দুই চরিত্রের অভিনেতা হিসেবে। তবে কি বাঙালীকে তিনি এও দেখাতে চেয়েছিলেন যে সহজ সরল ছা-পোষা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের 'অপু'-ই হতে পারে বিচক্ষণ, চিন্তাশীল, সত্যান্বেষী মনোভাব সম্পন্ন গোয়েন্দা 'ফেলু'/'ফেলুদা'। এ কথা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, 'অপুর সংসার', 'অপরাজিত'-র মতোন ছবিতে অভিনয় করতে পারা ছিল তাঁর কাছে শিক্ষনীয় এক সময়, যা মূলত ওনাকে বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করা শেখায়।

সত্যজিৎ রায়- এমন একটি অধ্যায় যাঁকে কিছু সীমিত শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ করা করা যায় না। ভারতীয় চিত্রনির্মাতা হিসেবে ভারতের বিভিন্ন ঐতিহ্যশালী জায়গার বিশেষত্বও তাঁর ঠাহর বন্দী হয়েছে। বিদেশী ছবির প্রভাবও পরেছে তাঁর একটি বিখ্যাত সংক্ষিপ্ত নীরব চলচ্চিত্র 'টু'-তে। 'প্রফেসর শঙ্কু' -র মতোন একজন বিজ্ঞানীকে উপহার দিয়েছেন বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যপ্রেমীদের। শুধু তাইই নয় সঙ্গীতের উপযুক্ত ব্যবহার নিয়েও যথেষ্ট গবেষণা করেছিলেন তিনি। তাঁর মতে, সঙ্গীত যা প্রকৃতির সাথে মিশে নির্দিষ্ট "মুড" তৈরী করতে পারে, তাই আজও 'ফেলুদা সিরিজ'-এর সেই নস্টালজিক আবহ সঙ্গীত বাঙালীর একান্তই প্রিয়। 'সিধু জ্যাঠা'-র মতো মানবরুপী গুগল-এর আবিস্কর্তাও তিনিই।

তাই সত্যজিৎ রায় শুধুমাত্র চিত্রনির্মাতাই নন, যেন আড়ালে মনস্তাত্ত্বিক স্তরকে ক্যামেরা বন্দী করতে পারা এক শিল্প সাধক।

পৌষালী চক্রবর্তী,

ষষ্ঠ সেমিস্টার (ইংরেজী বিভাগ)

সত্যজিৎ রায় ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের একত্রিত সৃষ্টি

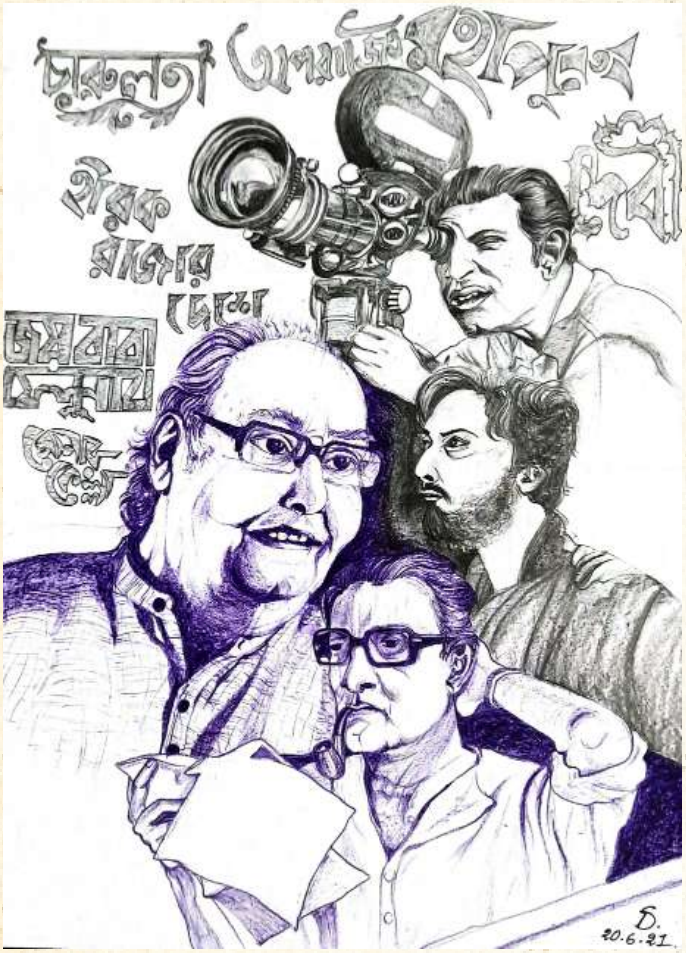

সুলগ্না দে, দ্বিতীয় সেমিস্টার

সত্যজিৎ রায় ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্র জগতের আদি প্রাণপুরুষ। শুধু বাঙালি নয় গোটা বিশ্ববাসীর কাছে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। ১৮৪৮ সালে পরিচালক ভিত্তোরিও ডি সিকা-র "দ্যা বাইসাইকেল থিভস" দেখেই পথের পাঁচালী সিনেমাটি তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৫৫ সালে মুক্তি পায় "পথের পাঁচালী" এবং তা ভারতীয় সিনেমার প্রেক্ষাপটকেই বদলে দিয়েছিল। এরপর একে একে নির্মাণ করেন "পরশপাথর", "অপুর সংসার", "জলসাঘর", "অভিযান "মহানগর ও মহাপুরুষ", "নায়ক", "গুপি গাইন বাঘা বাইন", "অরণ্যের দিনরাত্রি", "অশনি সংকেত", "সোনার কেল্লা", "শতরঞ্জ কি খিলাড়ি", "জয় বাবা ফেলুনাথ", "হীরক রাজার দেশে", "ঘরে-বাইরে", "গণশত্রু", "শাখা-প্রশাখা" এবং সর্বশেষ বানানোর সত্যজিতের সিনেমার নাম ছিল "আগন্তুক"।

১৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "অপুর সংসার" ছবিতে শর্মিলা ঠাকুর এর বিপরীতে অভিনয়ের মাধ্যমে চলচ্চিত্র জগতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবেশ। এই জগতে আসার আগে তিনি ছিলেন রেডিওর ঘোষক এবং তারসাথে মঞ্চে ছোট ছোট চরিত্রে অভিনয় করতেন। সত্যজিৎ রায় অর্থাৎ মানিকদা সৌমিত্রকে দেখেই "অপুর সংসার" ছবির পরিকল্পনা করে নিয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় প্রায় ৩৫টি ছবি করেন এবং তার মধ্যে ১৪টি ছবিতে অভিনয় করেন সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায়। অনেকের মতে সত্যজিতের মানসপুত্র সৌমিত্র।

সত্যজিৎ রায় বাঙ্গালীদের চিরন্তন কয়েকটি চরিত্র উপহার দিয়েছেন। 'অপু ত্রয়ী'তে যে তিনটি ছবি ছিল তা হলো "পথের পাঁচালী", "অপরাজিত" ও "অপুর সংসার"।

অপুর সংসার : অপুর সংসারের কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শর্মিলা ঠাকুর। ছবিটিতে আপুকে দেখানো হয় কলকাতার এক জীর্ণ বাড়িতে দারিদ্র্যের সাথে বসবাস করতে এবং একটা চাকরির জন্য অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে। এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে অপর্ণার সাথে তার বিবাহ হয়। তাদের বিবাহিত জীবন সম্পর্কে ছবিটির ধ্রুপদী ইতিবাচকতা ফুটে ওঠে কিন্তু এক বিয়োগান্তক পরিস্থিতি অপুকে ভেতর থেকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। ছবির সমাপ্তিতে যদিও ছেলে কাজলকে নিয়ে বাঁচার এক নতুন দিশা পায় অপু। এখানে অপু চরিত্রে সৌমিত্র নিজেকে এত সুন্দরভাবে তুলে ধরেছিলেন যে দর্শকের কথাও মনে হয়নি এটি তার প্রথম ছবি।

দেবী: অপুর সংসার যখন বাঙালি সমাজে ভীষণভাবে সমাদৃত হলো তখন সত্যজিৎ রায় বুকে এক বল পেলেন। তিনি পরবর্তী ছবি 'দেবী'র কাজে হাত লাগান। আমাদের হিন্দু সমাজের অঙ্গে অঙ্গে কুসংস্কার আর এটিই ছিল এই ছবির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিল সত্যজিতের প্রিয় দুই অভিনেতা অভিনেত্রী সৌমিত্র ও শর্মিলা। ছবিটিতে দয়াময়ী নামে এক তরুণী বধুর চরিত্রে অভিনয় করেন শর্মিলা ঠাকুর যাকে তার শশুর মশাই মা কালী বলে পূজা করতেন। সত্যজিতের আশঙ্কা ছিল যে সেন্সরবোর্ড হয়তো ছবিটিকে আটক করে দেবে যেহেতু ছবিটির মধ্যে ধর্মীয় কুসংস্কার ব্যাপারটি রয়েছে কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটেনি, ছবিটির খুব সহজভাবেই মুক্তি ঘটেছিল।

সমাপ্তি: ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত "তিনকন্যা" মুক্তি পায়। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোটগল্প "পোস্টমাস্টার", "মনিহারা" ও "সমাপ্তি" নিয়ে চলচ্চিত্রায়ন করা হয় এবং এই চলচ্চিত্র সংকলনের নাম দেওয়া হয় "তিনকন্যা", কারণ এখানে প্রধান চরিত্র নারী। তিনকন্যার তৃতীয় কন্যা হল "সমাপ্তি" ছবির মৃন্ময়ী। চঞ্চলপ্রাণ কিশোরী মৃন্ময়ীর বিবাহের প্রথাবদ্ধ আচরণে মানিয়ে নিতে না পারার গল্পকে হাস্যরসাত্মক ভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এই চলচ্চিত্রে। রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক গল্প গুলোর মাঝে একটি অনন্য সৃষ্টি "সমাপ্তি"। সত্যজিৎ রায় এই গল্পের চলচ্চিত্রায়ন করেছেন একেবারে নিজের মনের মতো করে মৃন্ময়ী সারাদিন টো-টো করে। মৃন্ময়ী সারাদিন টোটো করে ঘুরে বেড়ায়। হঠাৎ তার বিয়ে হয়ে যায় অমূল্য এর সাথে, সে গয়না গায়েই বাসর ঘর থেকে গাছ বেয়ে পালিয়ে যায় তার চিরপরিচিত জায়গায়, ছেলেমানুষিসুলভ চঞ্চলতা; কিংবা কাঠবিড়ালি পোষা এবং তার সাথে কথা বলার দৃশ্যগুলো কিশরীর স্বতন্ত্র জগতকে নির্দেশ করে এবং সেই জগৎ বাধাপ্রাপ্ত হয় বিবাহ নামক নিয়মতান্ত্রিক জালে। এখানেও মৃন্ময়ীর স্বামী অমূল্য এর চরিত্রে অভিনয় করেছেন সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায় ও মৃন্ময়ীর চরিত্রে অভিনয় করেছেন অপর্ণা সেন। "সমাপ্তি" ছবিটি রাষ্ট্রপতি রৌপপদক লাভ করে ১৯৬১ সালে।

সত্যজিতের এরকম বহু ছবিতেই সৌমিত্র অভিনয় করেছে। কেবল যে কেন্দ্রীয় চরিত্রেই অভিনয় করেছে তা নয় খলনায়কের চরিত্রেও অভিনয় করেছে ভারতীয় চলচ্চিত্রের আদ্যলগ্নের এনাদের ভূমিকা অতুলনীয়। তাঁদের সৃষ্টি চলচ্চিত্র জগতের মূল কারণ। এঁরা আর আমাদের মাঝে নেই ঠিকই কিন্তু তাঁদের সৃষ্টি সর্বদাই আমাদের মনে জাগ্রত হয়ে থাকবে।

মনীষা সামন্ত, চতুর্থ সেমিস্টার

টিনা মাজী, চতুর্থ সেমিস্টার

অনুভূতিতে সত্য-মিত্র

"ঐ দূরের নক্ষত্রমালায় তোমরা তারা হয়ে জ্বলো।

পৃথিবীর কান্না শুনতে কি পাও, দেখতে কি পাও, কিছু বলো।"

স্মৃতি গুলো খুব মনে পড়ছে আজ।

মনে পড়ে তোমাদের দীর্ঘ ৪২ ও দীর্ঘ ৬০ বছরের লাগাতার চলচ্চিত্রের শাসন। সার্থক জীবন তোমাদের। সেই কারণে তোমাদের আজীবনকাল সমগ্র বিশ্ববাসী মনে রেখেছে, মনে রাখছে ও চিরাচরিত মনে রাখবে।

অর্থ-প্রীতি-স্বচ্ছলতা কখনোই এক অভিনেতার, এক শিল্পীর সার্থকতা নয়। অন্তর থেকে সার্থকতা না এলে অভিনেতা, শিল্পীরা ফুরিয়ে যান।

নানান চরিত্রের মধ্যে নিজেদের কাজ করার ইচ্ছেটুকু জিইয়ে রেখেছিলেন জীবনের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত।

জীবনের শুরু সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে।অপু, অমূল্য, অসীম, ফেলুদা, উদয়ন পন্ডিত আরো অনেক অনেক চরিত্রের সাক্ষী তিনি।

পরিচালক সত্যজিৎ 'হীরক রাজার দেশে' অভিনেতা উদয়ন পন্ডিতের মাধ্যমে বার্তা দিয়েছেন "আমাকে বশ করলেও আমার ছাত্ররা থাকবে। তারা বড়ো হবে একদিন।"

আর 'ফেলু মিত্তির'- এর ক্ষুরধার দূরদৃষ্টিতা আর বলার অবকাশ রাখে না।

তাঁরা বেঁচে আছেন কখনো 'অভিযানে', কখনো 'দেবী'তে আবার কখনো 'সোনার কেল্লা'তে ফেলুদা হয়ে রহস্যে ঘেরা চলচ্চিত্রে। তাঁদের বেঁচে থাকার অস্তিত্বের তালিকাটা অনেক অনেক বড়ো।

সত্যজিৎ রায় বা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এরা কেউই শুধু বিখ্যাত অভিনেতা বা বিখ্যাত পরিচালক নন, তাঁরা একাধারে গীতিকার, চিত্রক, কবি, লেখক, নাট্যকার, থিয়েটার পরিচালক ও ছিলেন।

গ্রহন করেছেন বিভিন্ন পুরস্কার। তাঁদের ঝুলিতে সংগৃহীত হয়ে আছে "Legion of Honour" , "পদ্মভূষণ" এবং আরও অন্যান্য।

তোমাদের মনে রাখবে বাঙালি তথা পৃথিবী। তোমরা বেঁচে থাকবে তোমাদের কালজয়ী কাজে

আমাদের হৃদয়ে।

তাই তোমার কথায় বলি,

"রাতের সব তারাই আছে

দিনের আলোর গভীরে।।"

তৃষা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় সেমিস্টার

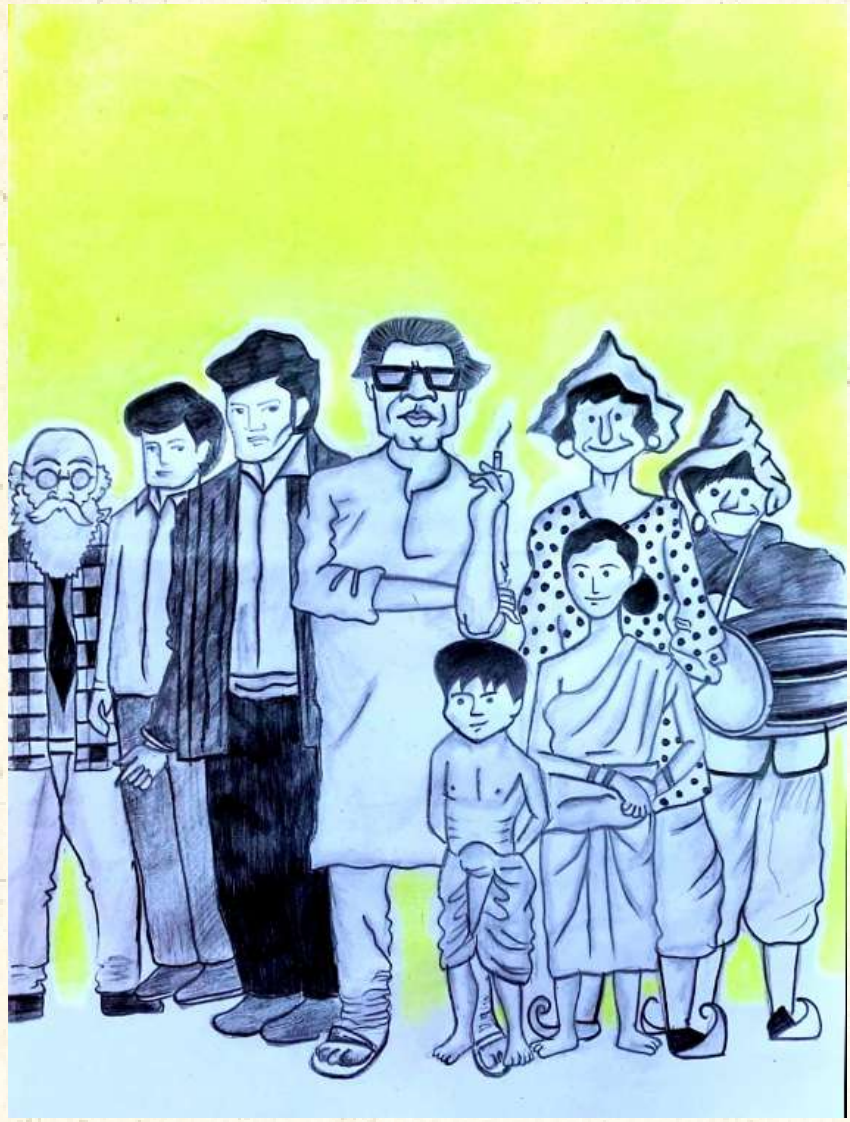

ঋষিতা দে, দ্বিতীয় সেমিস্টার

চলচ্চিত্রে সত্যজিৎ- সৌমিত্র মিলন

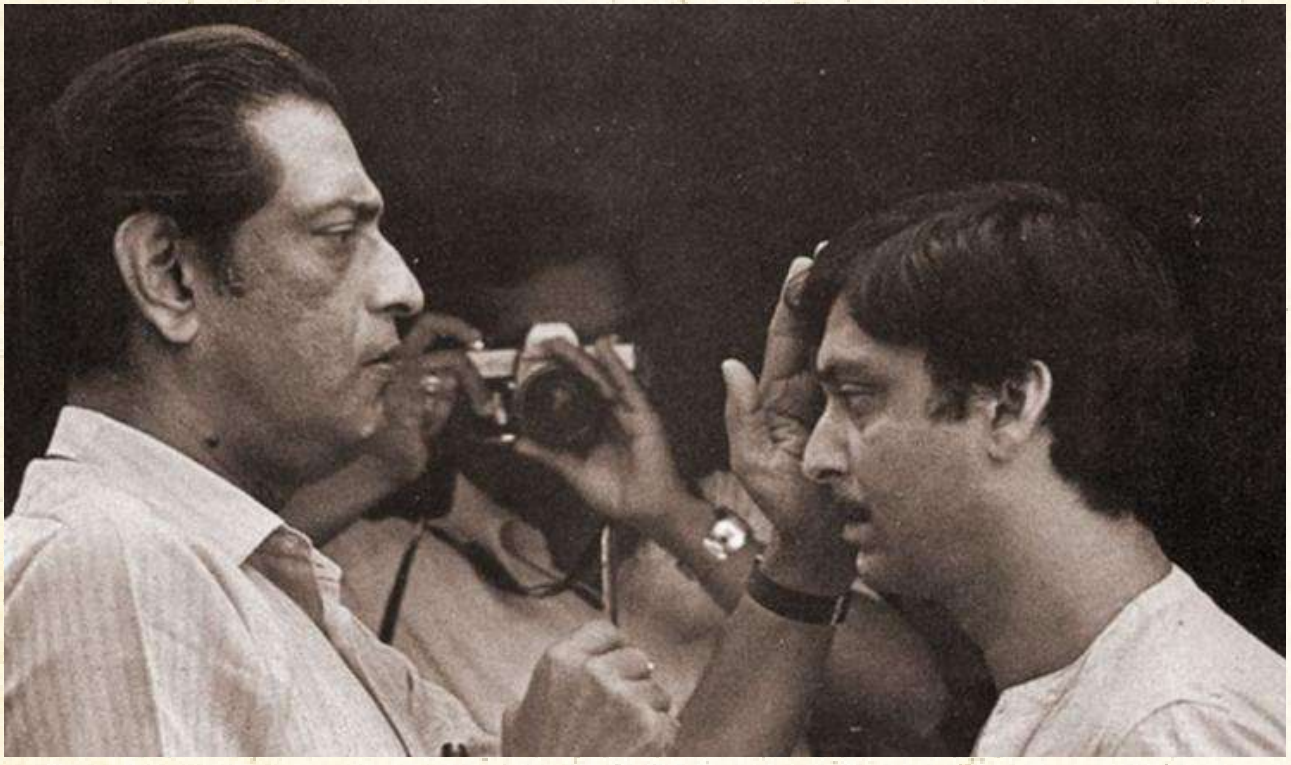

অশনি সংকেত এর সেট-এ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও সত্যজিৎ রায়

"এ হে আপনি যে বড্ড লম্বা হয়ে গেলেন।" – ঘরে ঢোকামাত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের মুখে একথা শুনে তাজ্জব হয়ে ওঠেন অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। নাট্যজগৎ থেকে স্বয়ং সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে চলচ্চিত্র জগতে আসার পর যত অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, পরিশ্রম, আনন্দ পেয়েছেন তার সমস্ত কিছুই সত্যজিৎ রায়ের দ্বারা প্রাপ্য। পরিচালক সত্যজিৎ রায় এবং অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রচলিত জুটির পরিচয় আমরা পেয়েছি স্বয়ং সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'মানিকদার সঙ্গে' গ্রন্থের মাধ্যমে।

প্রায় অনেকবারই শুটিং এর উদ্দেশ্যে বা কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই সত্যজিৎ রায়ের বাড়িতে যাতায়াত শুরু হয় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের, তবে এরই মধ্যে কখন যে তাঁদের মধ্যেকার সম্পর্ক 'আপনি' থেকে 'তুমি' আর 'মানিকবাবু' থেকে 'মানিকদা' হয়ে ওঠে তা বোঝা অসাধ্য। তারপর কখনো 'স্টানিস্ লাভস্কি'র বই পড়তে বলে, কখনো সিনেমা দেখাতে নিয়ে গিয়ে অভিনেতার সুনিপুণ অভিনয় দক্ষতা লক্ষ্য করতে বলে, আবার কখনো বা নিজের শুটিং স্টুডিওতে সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায়কে ডেকে বিভিন্ন সহকারী, অভিনেতা এবং অভিনেত্রীদের ক্যামেরার সামনে সুকৌশল কার্যকলাপ প্রদর্শন করিয়ে ধীরে ধীরে তাঁর পরবর্তী ছবির 'অপু' কে তৈরি করে নিচ্ছিলেন পরিচালক সত্যজিৎ রায়। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর জন্যই বলেছিলেন, শুধুমাত্র গুরু শিষ্য হিসাবেই নয় পিতৃস্নেহাভাবের আদর দিয়েই গড়ে তুলেছিলেন তাঁকে।

বহু স্মৃতির কথাও মনে পড়ে অভিনেতার। সেই রাতের কথা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে বারবার ফিরে এসেছে, যে রাত্রে শুটিং এর উদ্দেশ্যে ট্রেনে করে যাওয়ার সময় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং সত্যজিৎ রায় এক কামরায় একরাত থাকাকালীন নিদ্রাহীন অবস্থায় দুজনে বহু গল্পগুজব করে সারারাত কাটিয়েছিলেন। অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অবোধ বালকের মতো সত্যজিৎ রায়কে প্রশ্ন করে গিয়েছিলেন এবং তিনিও তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের আনন্দের সাথে আর বিনাদ্বিধাবোধে উত্তর দিয়ে গিয়েছিলেন। সেই রাত, সেই রাতে সত্যজিৎ রায়ের অপার স্নেহ কোনোকালেই ভুলতে পারেননি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

হাসি - ঠাট্টা, রসিকতা, গল্পগুজব, এভাবেই গড়ে উঠেছিল দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক। "অপুর সংসার" শুটিং এর সময় সত্যজিৎ রায় নিজ হাতে চুল আঁচড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁর 'অপু'কে। আবার "চারুলতা" চলচ্চিত্রে রাবীন্দ্রিক যুগের হাতের লেখা তৈরি করতে হয়েছিল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে, সেক্ষেত্রেও বহু সাহায্য পেয়েছিলেন তিনি স্বয়ং পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে এবং অবশেষে শৈশব অভ্যস্থ হাতের লেখা পাল্টে গড়ে উঠল এক নতুন ধাঁচের হাতের লেখা। দুজনের মধ্যেকার সম্পর্ক এতটাই ধীরে ধীরে গভীর হয়ে ওঠে যে ক্যামেরার সামনে সত্যজিৎ রায় সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে একটি সামান্য ইঙ্গিতের সাহায্যেই ভুল ধরিয়ে দিতে পারতেন। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে নতুন রূপে দর্শকের সামনে পুনরায় নিয়ে আসলেন সত্যজিৎ রায় 'জয়বাবা ফেলুনাথ' ও 'সোনার কেল্লা'য় 'ফেলুদা' চরিত্রের মাধ্যমে, তাই আজও 'ফেলুদা' বলতে আপামর বাঙালির চোখের সামনে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মুখটি ফুটে ওঠে। এভাবে পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের বহু চলচ্চিত্র থেকে পরিচিতি গড়ে ওঠে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের।

এছাড়াও চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় নিজ হাতে, স্বযত্নে এবং পরিশ্রম করে লেখা চলচ্চিত্রগুলিকে অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে পড়ে শোনাতেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া ও মতামত বহুল উৎসাহের সাথে জানতে চাইতেন। অসীম স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস এবং মনের আনন্দে অভিনয় করার অনুভূতি এই সমস্তটাই অভিনেতা সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় পেয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে।

স্বনামধন্য এই দুই ব্যক্তির মেলবন্ধনের দ্বারা সৃষ্ট কার্যকলাপ বাঙালির চলচ্চিত্র জগতে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। তাঁদের বিখ্যাত

বহু চলচ্চিত্রের মধ্যে কিছু উল্লেখ করা যেতে পারে, যেমন- 'অপুর সংসার' (১৯৫৯), 'দেবী' (১৯৬০), 'চারুলতা' (১৯৬৪), 'অরণ্যের দিনরাত্রি' (১৯৭০), 'অশনি সংকেত' (১৯৭৩), 'সোনার কেল্লা' (১৯৭৪), 'জয় বাবা ফেলুনাথ' (১৯৭৯), 'ঘরে বাইরে' (১৯৮৫) ইত্যাদি যা দর্শকের মনের মণিকোঠায় আজও বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

অনুসীমা মাঝি, চতুর্থ সেমিস্টার

ঋষিতা দে, দ্বিতীয় সেমিস্টার

ছোটদের ছবিতে সত্য-মিত্র

সোনার কেল্লার শুটিং চলছে

আধো বুলিতে বাচ্চাদের সঙ্গে কথা বলায় বিশ্বাসী ছিলেন না সত্যজিৎ রায়। বরং সমবয়সি বন্ধুর মতোই মিশতেন তাদের সঙ্গে। আর তাই তাদের মতো করেই তাদের বোঝার উপযোগী করে নানাধরনের ছোটদের ছবি নির্মাণ করেছিলেন তিনি। পথের পাঁচালী, গুপিগাইন বাঘা বাইন, গুপী বাঘা ফিরে এলো, হীরক রাজার দেশে, ভূতের রাজা দিল বর, পোস্টমাস্টার ইত্যাদি নানান ধরনের ছোটদের ছবি। তবে এসব কিছুর মাঝে ছোটদের ছবি হিসেবে সবথেকে বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল ফেলুদা অভিনীত 'সোনার কেল্লা' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। আর এই দুটি সিনেমাতেই সত্যের সঙ্গী ছিল মিত্র।

সত্যজিত রায়ের এক অসাধারণ কীর্তি এই 'ফেলুদা' চরিত্র নির্মাণ। শেক্সপিয়ার এর 'শার্লক হোমস' দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই গোয়েন্দা চরিত্রটি নির্মাণ করেছিলেন। আর এই কীর্তির সাথে তাঁর আরেক কীর্তি হলো সেই 'ফেলুদা'র চরিত্রে অভিনয় করার জন্য যোগ্য অভিনেতা কে খুঁজে নেওয়া। সত্যজিৎ রায়ের ছেলে সন্দীপ রায় এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন - "বাবা 'সোনার কেল্লা' ছবি করবেন ঠিক করার পরে অমন হ্যান্ডসাম ফেলুদা কে হবেন, তা নিয়ে আমার নিজেরও খুবই কৌতুহল ছিল।" অবশেষে সৌমিত্র

চট্টোপাধ্যায়কেই বেছে নেন সত্যজিৎ। কথায় আছে, 'জহুরী জহর চেনে' ঠিক তেমনভাবেই চলচ্চিত্র নির্মাতা তাঁর চরিত্র উপযোগী অভিনেতা চিনে নিয়েছিল। সত্যের কলমের ফেলুদাকে বড়ো পর্দায় নিজের অভিনয়ের দক্ষতা দ্বারা আরও জীবন্ত করে তুললেন সৌমিত্র।

'সোনার কেল্লা' পর্দায় অভিনীত হওয়ার আগে ফেলুদা পাঠকদের কাছে খুবই প্রিয় চরিত্র ছিল। আর সিনেমার পড়ে সেই ফেলুদা রাতারাতি আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠলো ছোটো বড়ো সকল দর্শকদের কাছেই। পরিচালক সাগ্নিক চট্টোপাধ্যায় একদিন মিত্র বাবুকে প্রশ্ন করেছিলেন "আপনিতো ফেলুদা করতে রাজি ছিলেন না। অথচ আজও আপনি সবথেকে পরিচিত ফেলুদা হিসেবে।" উত্তরে তিনি হেসে বলেছিলেন, "এর উত্তর শুটিংয়ে দেবো।" আর দিয়েছিলেন ও।

১৯৭৪ সালের বড়দিনের সময়ে 'সোনার কেল্লা' ছবি বড়ো পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল। এই ছবির সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফেলুদা সিরিজের আরেকটি রহস্য গল্পকে সত্য - মিত্র বড়ো পর্দায় নিয়ে এলেন। ছবির নাম 'জয় বাবা ফেলুনাথ'। ১৯৭৯ সালের ৫ই জানুয়ারি শিশু ও কিশোর চিত্র হিসেবে মুক্তি পেল ছবিটি। আর 'সেরা শিশু চলচ্চিত্র' হিসেবে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেল। ফেলুদা তাঁর মগজাস্ত্র দিয়ে নানা ধরনের রহস্যের সন্ধান ও সলভ করেছিলেন। এই দুই ছবির বাকি চরিত্রগুলির সঙ্গে যেমন তোপসে, জটায়ু, রুকু, মুকুল বাকি সকলের সাথেই খুব ভাব জমে উঠেছিল সৌমিত্রের। আত্মীয়তা যে রক্তের সম্পর্কের বাইরেও হয়, তা ফেলুদাই শিখিয়েছিলেন। আর এই দুই ছবিই উদঘাটন করতে গিয়ে শ্যুটিং স্পটের জন্য সত্যজিৎ ও সৌমিত্র একসাথে মজা করে ঘুরেও ছিলেন বেশ। কোনও জায়গায় যাওয়ার আগে যে সেই জায়গাটা সম্পর্কে পড়াশোনা করতে নিতে হয়, সেটাও শিখিয়েছিলেন প্রোদোষ মিত্র, ওরফে সত্যজিৎ।

এবার সবশেষে তাঁর সেই উত্তর টির কথা বলবো। "তিনি প্রথমে কেন ফেলুদা করতে চাননি?" তার উত্তরে তিনি এক ইন্টারভিউতে বলেছিলেন, "ওটা আমার ভুল। ছবির রিলিজের পর আমি রাস্তায় বেরোলে ছেলে-মেয়ে থেকে পূর্ণবয়স্ক লোকজন শুধু ফেলু বা ফেলুদা বলে ডাকে। আমার মনে হলো ওরা সবাই অপুকে বা গঙ্গাচরণকে ভুলে গেল? এত প্রিয় চরিত্র আমার। কিন্তু বয়সের সঙ্গে সঙ্গে এঁদের সকলের ভালোবাসাই নির্দেশের মতো এলো আমার কাছে। এত, এত লোক যদি অপু ও গঙ্গাচরণকে কম মনে রাখে বা ভুলেও যায়, শুধু ফেলুদা হিসেবে পরিচিত হলেই সেটা অভিনেতা হিসেবে আমার পরম পাওয়া।"

এখানেই ছোটদের ছবি বিশেষত ফেলুদা সিরিজে সত্যমিত্রের গুরুত্ব। একে অপরের প্রতি ভরসা - বিশ্বাস - ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা আজ তাদের যুগলে পরিণত করেছে। ছোটদের জন্য এই জুটি দিয়ে গেছে স্বর্ন স্বরূপ ছবিগুলি। সত্যজিতের সৃষ্ট গোয়েন্দা চরিত্র ফেলুদা ও তাঁকে নিয়ে লেখা সব গোয়েন্দা

উপন্যাস ও নির্মিত চলচ্চিত্র গুলির সঙ্গে সৌমিত্রের অভিনয় দক্ষতা মিলে একটি করে রত্ন নির্মন করে গেছেন। এখানেই তাঁদের সার্থকতা।

প্রীতিষা মাইতি,

চতুর্থ সেমিস্টার

ঋষিতা দে, দ্বিতীয় সেমিস্টার

ছোটগল্প

অন্ধকার

টুবাইয়ের এই দশা দেখে মিমির চোখে জল এলো। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল ওর। ছোট্ট ছেলেটাকে জবা গাছের নীচটায় নিজের হাতে শুইয়ে দিয়ে গেল ওরই মা। হাত-পা সোজা হয়ে খিঁচে আছে টুবাইয়ের সারা শরীর, ভেতরের নানা শিরা - উপশিরার টান ধরছে মাঝেমাঝেই। সেই কষ্টে ছটফট করে চলেছে ও, আর কেঁদে যাচ্ছে প্রাণপনে। মুখ ফুটে বলতে পারছেনা ও ওর ভেতরের ব্যাথা-যন্ত্রণার কথা। শুধু গলা ছেড়ে আর্তনাদ করে চলেছে। কিন্তু কেউ ওকে ধরছেনা। কেউ ধারে-কাছে ঘেষছেনা পর্যন্ত!! এমনকি ওর মাও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবটা দেখছে হা করে। মা - বাবার চোখ দুটোয় কিসের একটা প্রত্যাশা। হাতজোড় করে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। ছ- বছরের ছোট্ট টুবাইয়ের খুব করুন অবস্থা। ওর গলায় চার-পাঁচটা মাদুলি আর মালা পড়ানো। এমনকি হাতে আর পায়েও কিসের যেন শেকড়-বাকর বাঁধা। সারা গায়ে তেল সিদুঁর মাখিয়ে, ওপরে কিসের একটা জল ছড়িয়ে এই কনকনে শীতে ঠান্ডা মাটির ওপর শুইয়ে রেখেছে। গায়ে কোনো কাপড় নেই ওর। সবাই বলছে ওকে নাকি কোনো অশুভ ছায়া ঘিরে রয়েছে! যে ওকে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে ভেতর থেকে আঘাত করছে। তাই নাকি ও ছটফট করে খিঁচে উঠছে মাঝেমাঝেই। ঝাড়ু হাতে একজন লাল-পেড়ে সাদা শাড়ি পড়া, চুল খোলা আর কপালে একটা লাল টিপ পড়া মহিলা বলে উঠলো, 'ওরে বাচ্চাটা কিছু বলতে পারছেনা, আর দেখ খেতে পারছেনা কারণ, ওর গলায় সেই পিশাচ কাঁটা ঢুকিয়ে রেখেছে! হাতে পায়ে ঐ অশুভ আত্মার দড়ি বাঁধা, যা ও ছিন্ন করতে পারছেইনা।"... এই বলে বিড়বিড় করে কি যেন পড়ছে আর হাতের ঝাড়ুটা টুবাইয়ের চারিপাশে ঘুরিয়ে যাচ্ছে। ওর নাকি স্বল্পায়ু! পিশাচ টা নাকি শেষ করে দিচ্ছে ওর সারা শরীর ক্ষণে ক্ষণে। মা শীতলাও সেখানে নাকি নিরুপায়!!

মিমি কিছু বলতে পারছেনা ওর এই অবস্থার আসল কারণ। আর ও কি বলেনি!! অজস্র বার বলেও কোনো লাভ হয়নি। কেউ তো বুঝছেইনা, শুনছেইনা টুবাইয়ের সেই ভয়াবহ দুরারোগ্যের কথা। ওর না বলতে পারার, না দেখতে পারার, না শুনতে পারার কারণগুলো। কেন সে আর দাঁড়াতে পারেনা, বসতে পারেনা, কেন খেতে গেলেই টুবাই কেঁদে ওঠে দুমাসের শিশুর মতোন, কেন টুবাই আর সারা দেয়না ওর দিদির ডাকে, মা-বাবার ডাকে, কেন ওর ভাইটা ওর স্পর্শটুকুও বুঝতে পারেনা। হ্যাঁ, সত্যি তো এটাই, ওর আয়ু যে আর বেশিদিন নেই! ভেলোর, ব্যাঙ্গালোর সবজায়গায় একটাই উত্তর পেয়েছে মিমি "ও আর বেশিদিন বাঁচবেনা। এই বিরল রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, কোথাও নেই।" মিমি শুধু ভাবে যে কিনা ঘুরতে যেতে এতো ভালোবাসত, খেতে ভালোবাসত, পড়াশোনাতেও ভালো ছিল। দুরন্ত সেই ছ বছরের ছেলেটা আজ এক গ্রাম লোকের মাঝে অসহায়ভাবে গলা ছেড়ে কেঁদে চলেছে। মিমির বুকটা ফেটে যাচ্ছে কষ্টে। কিন্তু ওর কথা শোনার বা

বোঝবার মতো কেউ নেই ওখানে। ও শুধু শুনে যাচ্ছে সবটা। ওর মুখে কোনো ভাষা নেই। ওর কানে শুধু বাজছে টুবাইয়ের কান্না আর 'জয় মা শীতলা'র কলরব। সকলে ওকে ঘিরে রেখে দু হাত তুলে বলে চলেছে " জয় মা শীতলা, জয় মা শীতলা মায়ের জয় "....

মিমি বুঝতে পারছে অশিক্ষার চরম ও গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে এই গ্রাম। এই গ্রাম ওর টুবাই কে আরও অসুস্থ করে তুলছে। নিজেকে ওর বড়ো অসহায় মনে হলো। ওর একটা আওয়াজও ওই একশো লোকের কানের ধারে কাছেও গেলোনা। আজ ও একা। টুবাই একা। এই ঘুটঘুটে অন্ধকারের মাঝে ওরা আর কিছুই দেখতে পেল না।....

প্রীতিষা মাইতি,

চতুর্থ সেমিস্টার

ভালোবাসা

শ্রাবণ মাস।সারাদিন ঝুপঝুপ বৃষ্টি।সন্ধ্যা থেকে একটুখানি ধরেছে।রাত্রি সাড়ে আটটায় কলকাতার ট্রেন ঝিকরগাছি এসে থামল।দুর্যোগে একটুও ভিড় নেই। নামল একজন পুরুষ।নাম সুমন।

সুমন তার স্ত্রী আর তাদের একমাত্র মেয়ের সাথে কলকাতায় থাকে,সেখানকারই একটি হাইস্কুলেই সুমন বাংলার শিক্ষক।সুমনের পিসি এই ঝিকরগাছির সাদিপুর নামে একটি গ্রামে থাকেন।

পিসির তিন কুলে কেউ নেই।স্বামী দশ বছর আগে ডেঙ্গুতে মারা গেছে।তাদের কোন ছেলেমেয়েও নেই।তাই ছোটবেলা থেকেই সুমনকে ওর পিসি খুব ভালবাসে।নিজের ছেলের মতোই দেখেন আর সুমনও ওর পিসিকে খুব ভালবাসে, শ্রদ্ধাও করে।সুমন অনেকবারই পিসিকে কলকাতায় ওর নিজের বাড়িতে নিয়ে যেতে চেয়েছে কিন্তু পিসি তার স্বামীর ভিটে ছেড়ে কোথাও যাবেন না।তাই সুমন পিসিকে দেখাশোনা করার জন্য একজন বিশ্বস্ত মানুষকে রেখে দিয়েছে।তার নাম বাশু।আর সুমন মাঝে মাঝে এসে পিসির সাথে দেখা করে যায়।

দুদিন আগে বিকেলে পিসির শরীর খারাপের চিঠিটা পেয়ে, পরের দিন দুদিনের জন্য ছুটির দরখাস্ত স্কুলে জমা দিয়েই আজ সকাল সকাল একটু কিছু মুখে দিয়ে পিসির বাড়ির উদ্দেশ্য বেড়িয়ে পড়েছে সুমন।

স্টেশনে নেমে সুমন গেট পেরিয়ে পথে নেমে পড়ল।হনহন করে চলছে।হাতঘড়িতে তখন নয়টা বাজতে দশ।সন্ধ্যারাত্রি বলা যায়।এরই মধ্যে চারিদিক একেবারে নিশুতি।রাস্তার জল কলকল করে নালায় পড়ছে।ব্যাঙ ডাকছে গ্যাঙর-গ্যাং।চাঁদ দেখা দিল আকাশে।মেঘ ভাঙা ঘোলাটে জ্যোৎস্না।

পিসির বাড়ি পৌঁছে গেল সুমন।বাড়ির দরজায় ঠকঠক করে আওয়াজ করায় সুমনের মনে হল যেন বাড়ির ভিতর থেকে পিসি বলল "হ্যাঁ আসছি"।তার পরেই সুমনকে অবাক করে দিয়ে পিসি দরজাটা খুলে দিল।পিসিকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে তিনি অসুস্থ।পিসি তখন সুমনকে দেখে একগাল হেসে তাকে ভিতরের ঘরে নিয়ে গেল।তা সুমন ঘরে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল,তখনই পিসি এসে তাকে খেতে ডাকে।রীতিমত সুমন খেতে গিয়ে পুরো অবাক হয়ে যায়, দেখে যে এতো সবই তার পছন্দের খাবার।

সে যাই হোক,সুমন খেতে খেতে বলল- "তোমার তো শরীরটা ভাল নেই তা তুমি এত

কিছু কেন রান্না করতে গেলে বলতো?"

তা তখন হাসতে হাসতে পিসি বলল "নারে আমি ভালোই আছি ,বুঝলি তো হঠাৎই তোকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছিল, বয়স হয়েছে কখন যে কি হয়ে বলাতো যায় না ,তাই আর কি বাশুকে দিয়ে আমার শরীর খারাপের চিঠিটা পাঠিয়েছি,আমি জানি তোর কাজের খুব চাপ তাই অনেক দিন আসিসনি।"

"তা বাশু কোথায় ওকে তো অনেকখোন হল দেখতে পাচ্ছি না" সুমনের কথা শুনে পিসি বলল "ওকে আমি আমার কিছু ঔষধ আনতে পাঠিয়েছি,এই এক্ষুনি চলে আসবে।

সুমন খেয়ে নিজের ঘরে শুতে চলে গেল, বিছানায় সুয়ে পড়ল।তখন পিসি এসে সুমনের মাথায় হাত বুলিয়ে দেওয়াতে,ওর কিছুক্ষণের জন্য মনে হল "পিসির হাততা কেমন যেন একটা ঠান্ডা লাগল,ঠিক সেই রকম ঠাণ্ডা যখন মানুষ মরে যায়।"

সারাদিনের ক্লান্তিতে সুমনের খুব তারাতারি ঘুম এসে গেল কিন্তু পরের দিন সকালে সে যা জানতে পারল তা শুনেই সুমনের চোখ কপালে উঠে গেল।

পরেরদিন সকাল তখন চারটে বাজে ,সুমন উঠে পিসিকে খুজজে আর এদিকে বাশু বাড়ি এসে সুমনকে দেখতে পেয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বলল "বাবু আরেকটু আগে আসতে পারলে না"

"কেন?"সুমন অবাক হয়ে তাকিয়ে বলল।বাশু তখন বলল " মাসিমার বিগত পাঁচদিন ধরেই শরীরটা ভালো না,জ্বর,বুকে ব্যথা।তাই দেখে তোমাকে ওই চিঠিটা লিখেছিলাম,তারপর কালকে বিকেলে পরিস্থিতি আরও অবনতির দিকে যাওয়ার ফলে গ্রামের হাসপাতালে মাসিমাকে ভর্তি করলাম,তখন মাসিমার পুরো অচৈতন্য অবস্থা।যখন একটু জ্ঞান এল তখন শুধুমাত্র তোমারই খোঁজ করছিলো গো বাবু। তারপর অনেকক্ষণ পরে কোন সাড়া না পাওয়ায় আমি ডাক্তারবাবুকে ডাকলাম, তা ডাক্তারবাবু বললেন যে মাসিমা ঘুমের মধ্যেই ব্রেইন স্টোকে মারা গেছে।তা তুমি না আসার কারণে আমি ওনার শেষকৃত্য করে এই ফিরলাম।",

বাশুর মুখে সব শুনে সুমন হতবাক হয়ে তাকিয়ে আছে আর বিরবির করে একটাই কথা বলছে "তাহলে আমি যে কালকে....."

তারপর সুমন পিসির সব কাজকর্ম মিটিয়ে, বাশুকে ওর পাওনা মিটিয়ে ,সুমন কলকাতায় ফিরে আসল।

আর ফিরে আসতে আসতে সুমন একটাই কথা ভাবছিল যে "একেই হয়তো ভালোবাসা বলে আর হ্যাঁ মনের টানও বটে।"

মন্দিরা বসাক, দ্বিতীয় সেমিস্টার

রামধনুর দু'টি রং"

"চিকেন, খাবি না, খাবি না কিন্তু চিকেন বলে দিলাম..." বলে রেস্টুরেন্টের ভেতরেই চিৎকার করতে লাগলো শ্রুতি। চিকেনের পিসটা হা করে চিকেনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এই হলো চিকেনের এক দোষ। চোখের সামনে যে কোনো স্বাদের খাবার দেখলেই ও আর নিজেকে সামলাতে পারেনা। চচ্চড়ি থেকে চাইনিজ, মৌরলা থেকে মোগলাই যে কোনো খাবারেই ওর জুড়ি মেলা ভার।

চিকেনকে রেস্টুরেন্টের ভেতর শ্রুতির এই হঠাৎ চিৎকার সামাল দিতে গিয়ে একটু মিথ্যে হাসির ছলনা করতেই হল লোক সমাজে। শেষমেশ শ্রুতিকে না খাওয়ার আশ্বাস দিয়ে সাময়িক শান্ত করা গেল। হাওয়া গরম দেখে কোনো কথা না বাড়িয়ে বিল পেমেন্ট করে তিনতলা থেকে সোজা নীচে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো ওরা।

এক সপ্তাহ আগেই চিকেনের শারীরিক তাপমাত্রা একশো চার ডিগ্রি থেকে নেমে বর্তমানে আটানব্বইয়ের কাঁটায় দাঁড়িয়ে আছে। রাতবিরেতে বাড়িতে ডাক্তার আনা, পরদিন কাক ডাকা ভোরেই হাসপাতালে দৌড়ানো, চার দিনের স্যালাইন ও সুঁচের অসহ্য; যন্ত্রণা এই সব কিছু সহ্য করে এখন একটু ' ভালো আছি ' -র দিকে যাত্রা শুরু করেছে সে এবং ইতিমধ্যেই রেস্টুরেন্টে পেট পুজো করতে চলেও এসেছে। আসলে এসেছে শ্রুতির পেট পুজো করাতে এবং অন্যদের পেট পুজো দেখতে। ওর ওপর রেস্ট্রিকশনের চড়া লিস্ট এখন। দুটো রুটি এবং ভেজ কারি টেবিলের এপাশে এবং টেবিলের ওপাশে মটন বিরিয়ানী, চিকেন বাটার মশালা ও কোল্ড ড্রিংক- এর গ্লাস। বঙ্গসন্তান বলেই হয়ত ভোজনরসিক হয়েও ওর এতো সহনশীলতা।

"চিকেন, খাবি না, খাবি না কিন্তু চিকেন বলে দিলাম..." না চিকেন ওর নাম না। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড থেকে শুরু করে থার্ড ইয়ারের ফাইনাল রেজাল্ট, সব জায়গাতেই ওর নাম লেখা চয়ন দত্ত। ছোটোবেলায় চিকেনের প্রতি অতি ভক্তি দেখেই হয়ত ডাক নামটি চিকেন হয়ে গেছে।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে চিকেন আর শ্রুতি দুজনেই অটোতে উঠলো। দুজনেই নামবে রাসবিহারী। শ্রুতিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে চিকেন যাবে গল্ফ গ্রীন।

"পরের সপ্তাহে কি মনে আছে তোর চিকেন?" শ্রুতির এই প্রশ্নের কি উত্তর দেবে বুঝতে পারলো না চিকেন। শুধু ওর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

"কেন রে, কি আছে? ও রঞ্জন দা পরের সপ্তাহে ইন্ডিয়াতে ফিরছে তাই না!" চিকেনের মুখে এই পাল্টা প্রশ্ন শুনে একটু নিস্তেজ হয়ে পড়লো শ্রুতি।

রঞ্জন সেন হলো শ্রুতির দাদা। ওর থেকে বছর সাতেকের বড়ো।বঙ্গ ভূমির মাটির গন্ধ ত্যাগ করে সে দীর্ঘ পাঁচ বছর ইংল্যান্ডে ছিল রিসার্চের খাতিরে। পরের সপ্তাহে সে ফিরছে দেশে। তাই নিয়ে শ্রুতিদের বাড়িতে বিরাট তোড়জোড় চলছে এখন। তবে হ্যাঁ, পরের সপ্তাহে রঞ্জন দা'র বাড়ি ফেরা ছাড়াও আরও একটি বিশেষ দিন আছে। চিকেন নিজে তা জানলেও শ্রুতিকে তা জানতে দিলো না। আর সম্ভবত শ্রুতি সেই দিনের কথাই জানতে চেয়েছিল।

"হ্যাঁ রে, দাদা পরের সপ্তাহের শুক্রবার এখানে আসছে। জানিস বাপি,মা,পটাই দা সবাই খুব এক্সসাইটেড। দাদার ঘরটা বাপি আবার রং করাচ্ছে। নতুন খাট,সোফা এনেছে।" কথা গুলো বলতে বলতে শ্রুতির চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও মনের ভেতরের ঝাড় বাতিটা কেমন যেনো টিমটিম করে জ্বলতে থাকলো।

"আর তোর কি প্ল্যান শুনি?"

"আমার প্ল্যান বিরাট রে। দাদাকে তো বলেই রেখেছি প্রথম এক সপ্তাহ আমি ছাড়া আর অন্য কারুর সাথে ওর কোথাও বেরোনো চলবে না। শপিং,সিনেমা,খাওয়া-দাওয়া সব কিছুর প্ল্যান একেবারে ফিক্সড। আর রবিবার তো..." কথা গুলো শেষ হতে না হতেই শ্রুতির বাড়ির দরজাটা ওদের দুজনের দিকে আড় চোখে তাকিয়ে মনে করিয়ে দিলো ওদের দুজনের গন্তব্যের শেষ ঠিকানা এটাই।

"কি রে ভেতরে আসবি না? বাপির সাথে দেখা করে যা একবার।"

"না রে, আজ আর ভেতরে যাব না। বাড়ি ফিরে একটু ব্যাংকে যেতে হবে। আজ আসি রে।"

"আচ্ছা সাবধানে যাস। পৌঁছে জানাস।"

শ্রুতির দিকে একবার হাত তুলে ওকে বাই বলে ওখান থেকেই একটা অটো ধরে চিকেন বাড়ির দিকে রওনা দিলো।

****

চিকেন আর শ্রুতি সমবয়সী। ক্লাস ইলেভেনের ফিজিক্স কোচিং-এ প্রথম আলাপ। তারপরে নোটস দেওয়া-নেওয়া থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিকের পর একই কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার লাইনে দাঁড়ানো, সবই একসাথে করেছে ওরা।

চিকেনের বাড়িতে বাবা,মা,ওদের পোষা কুকুর বোজো আর 'দ্য গ্রেট' চিকেন দত্ত থুড়ি চয়ন দত্ত

থাকে। 'দ্য গ্রেট' শব্দ দুটো ব্যাবহারের পেছনে শুধু চিকেনের নিজের প্রতি অগাধ ভালোবাসাই কারণ না বরং আরও কিছু পারিপার্শ্বিক কারণও আছে।

ছোটোবেলায় ওর জন্ম হয় বড়লোকী বনেদী দত্ত পরিবারে। বাড়িতে সব মিলিয়ে সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন। ধীরে ধীরে ওর বয়স ও চেহারা যতো বাড়তে থাকে বাড়ির আঙিনা ততোই ছোটো হতে থাকে। কাকা,জ্যাঠা,পিসিমণি সবাই যে যার মতো বাইরে বাড়ি করে চলে যেতে থাকে ও দাদা-দিদি দের ভেতর কেউ কেউ মায়া ত্যাগ করে বাইরে চলে যায় আর কেউ কেউ ওর মতোই পরিবারের দায়িত্ব বহন করার জন্য এখানে থেকে যায়।

বনেদী বাড়ি প্রোমোটারের হাতে তুলে দেওয়ার পর হাতে যা টাকা এসেছিল তাতে শহরের বুকে গল্ফ গ্রীনে 3BHK ফ্ল্যাট কিনতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। তবে নিজেদের অতো বড়ো বাড়ি বিক্রি করে এতো বড়ো ফ্ল্যাটের দশ তলাতে থাকতে চিকেনের বাবার একটু অসুবিধে হয়েছিল প্রথম দিকে। বনেদী বাড়ির আঙিনা ছেড়ে ফ্ল্যাটের হাতছানি- বাবার পক্ষে মানিয়ে নেওয়া সত্যিই একটু কষ্টকর ছিল। এখন ওর বাবা এই পরিবেশটার সাথেই নিজেকে বেশ মানিয়ে নিতে শুরু করেছে।

শ্রুতির বাবা সমরেশ কাকুকে চিকেন ছোটো থেকেই চিনতো। ওর জ্যাঠার বন্ধু ছিল সমরেশ বাবু। মাঝে মধ্যেই ওদের বাড়ি আসত। তবে শ্রুতির বাবা হিসেবে সমরেশ কাকুকে ক্লাস টুয়েলভে চেনে সে। সমরেশ কাকু এবং গীতা আন্টি ওকে ভীষণ ভালোবাসে এবং ওর আর শ্রুতির এই সম্পর্কে ওদের দু'জনের বাড়ির তরফ থেকেই পূর্ণ সমর্থন আছে।

****

"কিরে শ্রুতি, তুই আর রঞ্জন দা কখন বেরোবি? বেশি রাত করিস না কিন্তু। তাড়াতাড়ি বাড়ি আয়"

"আরে বাবা হ্যাঁ রে। দাদা আজ এতোই টায়ার্ড যে ওর আর ভালো লাগছেনা এখানে থাকতে। ক্যাব বুক করেছি , এলেই উঠে পড়বো। এই রাখ রাখ, গাড়ি এসে গেছে।" বলে শ্রুতি ফোন রেখে দিল।

আজ শুক্রবার। সকালেই রঞ্জন দা কলকাতা ফিরেছে আর পাগলী শ্রুতিটার আজই দাদার সাথে বেরোনো চাই। সেই বিকেলে বেরিয়েছে আর এখন রাত এগারোটা বাজতে যায় এখনও রাস্তায়। চিন্তায় চিন্তায় চিকেনের পাগল হবার জোগাড়। এমন সময় চিকেনের ফোন বেজে ওঠে।

"কিরে শ্রুতি, পৌঁছে গেছিস?"

"হ্যালো, আপনি কি চয়ন বলছেন?"

"হ্যাঁ, আমিই মি. চয়ন। কিন্তু আপনি কে? আর এই ফোন আপনার কাছে গেলো কি করে?"

"আপনি আমাকে চিনবেন না। এটি যার ফোন তার কল লিস্টে লাস্ট ডায়াল নম্বর আপনারই ছিল,

তাই আপনাকে ফোন করছি। এটি যার ফোন রাস্তায় তার কার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। ওনার সাথে একজন ভদ্রলোকও আছেন। ড্রাইভার সম্ভবত স্পট ডেড। সেটা আমরা ইনভেসটিকেট করছি। ওনাদের দুজনকে কাছের একটি হাসপাতালে আমরা ভর্তি করছি। আপনি যতো শীঘ্র সম্ভব চলে আসুন।" কথা গুলো শেষ হবার সাথে সাথেই ফোন কেটে যায়।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও মনে হয় মানুষের নিজেকে এতোটা অসহায় লাগে না। কোনো কথা বলার সাহস বা ক্ষমতা কোনোটাই আর চিকেনের থাকলো না। নির্জীব পাথরের মতো চিকেন সোফার ওপর বসে পড়লো। চোখের সামনে থেকে ওর জীবনের সব রঙ যেন ধূসর বর্ণ হয়ে গেল এক নিমেষে। নিজের ভালোবাসা,নিজের প্রেমিকা,নিজের সব থেকে ভালো বন্ধু নাকি নিজের দিনের শেষের একমাত্র আশ্রয়! কাকে হারানোর যন্ত্রণা ওর মধ্যে সব থেকে বেশি?

****

আজ রবিবার। শ্রুতির জন্মদিন। সন্ধ্যেবেলা ওর বাড়িতে চিকেনের নিমন্ত্রণ আছে। সন্ধ্যে ছ'টা নাগাদ চিকেন খুব সুন্দর করে একটা রঙিন পেপারে মোড়া বাক্স নিয়ে শ্রুতির বাড়ি রওনা দিল।

"আরে চয়ন যে, এসো এসো ভেতরে এসো। শ্রুতি ওপরে আছে। যাও ওপরে ওর ঘরে যাও।"

"কাকু, কাকিমা আর রঞ্জন দা কোথায় গো?"

"তোমার কাকিমা রান্নাঘরে আর ঋজু ওর নিজের ঘরে আছে।"

"আচ্ছা কাকু।" বলে চিকেন সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেলো।

****

গতকাল চিকেন আর শ্রুতির পরিবারের ওপর দিয়ে এক ঝড় বয়ে গেছে। শুক্রবার রাতটা চিকেনের কাছে যেন এক বিভীষিকাময় দুঃস্বপ্ন।

অ্যাক্সিডেন্টের পর চিকেন যখন প্রায় ছুটতে ছুটতে হাসপাতালে গিয়ে পৌছায় ততক্ষনে সেখানে সমরেশ বাবু ও তার স্ত্রী দুজনেই এসে গেছেন। রঞ্জনের ডান হাত ভেঙে যায় ও মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়। সেরে উঠতে প্রায় মাস দুয়েক লাগবে। শ্রুতির হাত,পা অক্ষত থাকলেও ওর চোখ দুটোকে বাঁচানো যায়নি। ডাক্তার অপারেশন করেন। কিন্তু ভাগ্যের ফের কে আটকাবে? চোখের কর্নিয়াতে বিরাট জোরে আঘাত পায় শ্রুতি। অনেক চেষ্টার পরেও শ্রুতির চোখ দুটোতে দৃষ্টি দেওয়া আর সম্ভবপর হয়নি। শ্রুতির চোখ থাকবে তাতে দৃষ্টি থাকবে না; শ্রুতির কাছের মানুষ গুলো ওর কাছে থাকবে কিন্তু ও তাদের দেখতে পারবে না আর কখনো। ওর চোখের সামনের রঙিন, ঝলমলে দুনিয়াটা এক রাতের ভেতর সাদা-কালো ক্যানভাস হয়ে গেছে।

নিজের দুই ছেলে-মেয়ের এরকম করুণ দশা দেখে সমরেশ বাবু ও তার স্ত্রী স্বভাবতই নিজেদের আর সামলাতে পারেন নি। চিকেন তাদের পাশে শক্ত পিলারের মতো এসে দাঁড়ায়। সব ঠিক হয়ে যাবে- এই মিথ্যে আশ্বাস দেয় তাদের এক কঠিন বাস্তব থেকে বের করে আনার জন্য।

আসলে জীবনের পথে চলতে চলতে আমরা বুঝতে পারি যে, সব কিছু কখনো ঠিক হয়ে যায় না, তাকে ঠিক করে মানিয়ে নিতে হয়। সবার জীবনটাই ওই ভূগোল বইয়ের মানচিত্রের মতো; সরলরেখা বক্ররেখায় ভরা।

****

শ্রুতি আর কখনো দেখতে পাবে না জেনেও ওরা সারা বাড়িটাকে আজ বেলুন,রং বেরঙের পেপার, টুনি লাইট দিয়ে সাজিয়েছে।

"কিরে, এখনও রেডি হোসনি কেন? কাকু,কাকিমা,রঞ্জন দা সবাই ওয়েট করছে নীচে তোর জন্য। জলদি কর।"

"তুই কখন এলি?"

"এই তো একটু আগে। কাকু বললেন তুই ওপরে আছিস। তাই চলে আসলাম।"

"আমি নীচে যাবনা চিকেন। প্লিজ আমায় জোর করিস না। পায়ে খুব ব্যাথা। পরশু রাতে খুব জোরে..."

"তোকে কোলে করে নিয়ে যাব আমি। 'আমি নীচে যাবনা চিকেন'। ইয়ার্কি নাকি রে!"

শ্রুতি আর কথা বাড়ালো না। চুপ করেই খাটে বসে রইলো। চিকেন একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শ্রুতির সামনে বসলো। হাতের রঙিন প্যাকেটটা খাটের ওপর রেখে শ্রুতির কপাল থেকে ওর চুল গুলো দু'হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললো, "শ্রুতি, ইটস নট অনলি অল অ্যাবাউট ইউ। ইটস অ্যাবাউট আস।"

"আমি চাইনা চিকেন তোর জীবনটা এইভাবে থমকে যাক আমার মতো একটা মেয়ের জন্য।"

"আমার জীবন আজ থেকে এক নতুন পথে পা বাড়ালো শ্রুতি।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে শ্রুতি, "ছেড়ে চলে যাবিনা তো!"

"ছেড়ে যাবার মতো কখনো কিছু হতে দেবো না। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ গিফট আছে আমার কাছে।"

"গিফট দিয়ে আর কি করবো বল! তাকে দেখবার ক্ষমতাও আমার আর নেই।"

"পাবি পাবি। সব দেখতে পাবি।", এই বলে চিকেন খাটের ওপর রাখা বাক্সটা খুলল। শ্রুতি অবাক হয়ে গেলো চিকেনের কথা শুনে। কি এমন সারপ্রাইজ গিফট যা ও নিজের চোখে দেখতে পারে!

"এটা কি বলতো?"

"কি? আমি জানিনা। বুঝতে পারছি না।"

"তোর ফেভারিটে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কেক। চকোলেট উইথ ভ্যানিলা কেক। আমি নিজে আজ বানিয়েছি। কি রে, চোখ বন্ধ করেও দেখতে পেলি তো!"

চিকেন দেখলো শ্রুতির দু'চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়ছে।

"আমি কাঁদতে শুরু করলে কিন্তু চোখের জল গুলো কেকটার ওপর পড়বে আর সুন্দর কেকটা পুরো নোনতা হয়ে যাবে।"

শ্রুতি গাল মুছে নাক টানতে টানতে বললো,"মি. চয়ন দত্ত আবার কাঁদতেও পারেন নাকি?"

"নাহ, মি. চয়ন দত্ত কাঁদে না কিন্তু চিকেন কাঁদে। শ্রুতির সামনে কিন্তু ওর চোখের আড়ালে।"

"আমাদের রামধনুটা বেরঙিন হয়ে গেলো রে।"

"আজ থেকে আমাদের রামধনুর দুটো রং। সাদা-কালো ক্যানভাসে এবার থেকে আমরা রামধনু আঁকবো।"

কিছুক্ষণ চুপ থেকে চিকেনের হাত ধরে শ্রুতি বললো,"জানিস চিকেন, এতো কিছুর ভেতর থেকেও মা শুধু বলে নেই নেই নেই। কিন্তু আজ থেকে আমি বলবো আছে আছে আছে। না থেকেও সে আছে। ভীষণ ভাবে আছে।"

(সমাপ্ত)

দেবীকা সাহা,

ষষ্ঠ সেমিস্টার (স্নাতক সাধারণ)

রমেশবাবুর রহস্যভেদ

কোলকাতা শহরের একটি দুতলা বাড়িতে থাকতেন বছর পয়েতিরিশ এর রমেশবাবু ও তার বছর চার কি পাঁচ এর ছোট্ট মেয়ে তিন্নি। রমেশবাবুর স্ত্রী বছর দুই হলো মারা গিয়েছেন তাই এখন তিনি ও তার মেয়েই থাকেন একসাথে এবং রমেশবাবুই মেয়ের সমস্ত কাজ করেন এবং ঘরের কাজও তাকেই করতে হয়।এরই মধ্যে একদিন সকালে বাড়ির বাইরে হঠাৎ কলিংবেলটা বেজে উঠলো এদিকে ব্যস্ত রমেশবাবু হাত মুছতে মুছতে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং দেখলেন বাইরে পোস্টমাস্টার এসে ডাকাডাকি করছে তাকে দেখে রমেশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন - কিহে পোস্টমাস্টার এখানে?

পোস্টমাস্টার তার উত্তরে বললে - তোমার জন্য একটা চিঠি এসেছে।

সেই চিঠিটি নিয়ে রমেশবাবু পোস্টমাস্টারকে বিদায় দিলেন কিন্তু বাড়ি ঢুকে রমেশ বাবুর আর তাড়াহুড়োতে সেই চিঠিখানি খুলে দেখা হলো না তাই তিনি সেটিকে পড়ার টেবিলে রেখে দিয়ে তিন্নিকে নিয়ে চলে গেলেন।এরপর রাতে রমেশবাবু ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফেরেন এবং এসে ঘরের বাকি কাজ করেন তারপর মেয়ের সাথে গল্প করতে বসেন তখন হঠাৎই তার নজর যায় সেই চিঠিখানির ওপর এবং তারপর তিনি সেই সেই চিঠিখানি নিয়ে দেখতে থাকেন কে সেই চিঠিটি পাঠিয়েছে তারপর তিনি চিঠির নামটি দেখার পর কিছুটা অবাক ও কিছুটা আনন্দিত হন সেই দেখে ছোট্ট তিন্নি জিজ্ঞেসা করে - বাবা চিঠিটা কে পাঠিয়েছে?সেই প্রশ্নে রমেশবাবু উত্তর দেন - আমার বন্ধু নিখিল চিঠিটা পাঠিয়েছে।সে আমাদের নেমন্তন্ন করেছে তার কাকার মেয়ের বিয়ে।তিন্নি আবারও জিজ্ঞাসা করে - বাবা নিখিল কে?

তার প্রশ্নে রমেশবাবু উত্তর দেন যে নিখিল তোর ছোটবেলাকার বন্ধু যার সাথে তিনি পড়াশোনা করেছেন এবং তার পরিবারের সাথেও যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক ছিল রমেশবাবুর পরিবারের।তিনি এও বলেন তারা পুজোর সময় একসাথে অনেক আনন্দ করতেন পূজোয় সবার সাহায্য করা একসাথে নিখিলের বাড়িতে পুজোর চারদিন খাওয়া দাওয়া আর কতকি।এই বলতে বলতে রমেশবাবু ঠিক করে ফেললেন যে তিনি যাবেন। রমেশবাবু অনেক বছর পর তার দেশের বাড়ি যাচ্ছি যাচ্ছেন তিনি কলকাতায় এসেছিলেন সূত্রে কাজের সূত্রে এবং পরবর্তীকালে তিনি এখানেই বসবাস করতে শুরু করেন আর প্রায় দশ বছর পর তিনি দেশে যাবেন তিন্নিও এই প্রথম কোনো নেমন্তন্ন পেয়ে খুব খুশি। রবিবার সকাল দশটার ট্রেন তাই সকাল সকালই রমেশ বাবু ও তার ছোট্ট মেয়ে তিন্নি দুজনে বেরিয়ে পড়লেন।

গ্রামটির নাম পুতুলনগর। জায়গাটি আর চার পাঁচটা গ্রামের থেকে একটু আলাদা এখানে বিদ্যুতের তেমন ব্যবস্থা নেই এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার দিক থেকেও দেশ অনুন্নত বললেই চলবে বাড়িগুলির দেওয়াল কাঁচা এবং চাল খড়ের তৈরি, এখানে রাস্তাঘাট মাটির, চারদিকে জঙ্গল গাছপালায় ভর্তি এবং দূরে একটি পুরানা মন্দির এবং সেই মন্দিরের থেকে একটু দূরেই নিখিলের বাড়ি,নিখিল জমিদার বাড়ির ছেলে এবং এই গ্রামে তাকে সবাই এক ডাকে চিন্ত তাই রমেশ বাবুর নিখিলের বাড়ি চিনতে কোন অসুবিধা হয়নি। বাড়িটি শুধু বাড়ি নয় একটি রাজপ্রাসাদ সেখানে বড় বড় সব স্তম্ভে বাড়িটি তৈরি নিখিলের বাড়িতে প্রথমেই দুটি দুয়ার পরে একটি বড়ো দুয়ার ও দ্বিতীয়টি ছোটো দুয়ার আর এই বড়ো দুয়ার ও ছোটো দুয়ারের মাঝে একটি বিশাল বড়ো বাগান পরে, ছোটো দুয়ার পেরোলে একটি উঠান পরে তারপর ঘর। রমেশবাবু ও তিন্নি বড়ো দুয়ার দিয়ে প্রবেশ করতে না করতেই এক বছর পয়েতিরিস এর ভদ্রলোক পরনে তার ধুতি পাঞ্জাবি এবং চোখে কালো ফ্রেমের চশমা তাদের লক্ষ্য করে একগাল হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছেন। রমেশবাবু বুঝতে পারলেন ইনি নিখিল চৌধুরী।নিখিল বাবু হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন এবং বললেন - কিহে রমেশ কেমন আছো?তোমার তো আর দেখাই পাওয়া যায় না।এই বুঝি তোমার মেয়ে তিন্নি খুব মিষ্টি দেখতে হয়েছে,আসো ঘরে আসো।

রমেশবাবু নিখিলবাবুর সাথে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন - এই চলে যাচ্ছে তুমি কেমন আছো বলো? এরপর ঘরে ঢুকে নিখিল বাড়ির আর নতুন সব সদস্যদের সাথে আলাপ করায়।নতুন সদস্য বলার কারণ নিখিলের বাড়ির সব সদস্যদেরই রমেশবাবু চিনতেন শুধু নিখিলের স্ত্রী এবং তার দুই ছেলে মেয়ে বাদে।কাকা,কাকিমা,তাদের মেয়েকে দেখেই পেরে গেলেন রমেশবাবু এবং নিখিলের পিসিমা তাকে দেখেই আনন্দে ' পিসিমা ' বলে উঠলেন রমেশ বাবু।এই পিসিমা খুব ভালো নাড়ু বানাতেন এবং রমেশ বাবুরা তা চুরি করে খেতেন কিন্তু পিসিমা জানতে পারলেও তাদের বক্তেন না। পিসিমাকে আগাগোড়াই সবাই ভালোবাসতেন, তিনি খুব মিশুকে প্রকৃতির লোক ছিলেন।যাইহোক এই বিয়ের কটা দিন খুব মজা করে কাটানো গেল এদিকে ছোট্ট তিন্নিও নিখিল বাবুর ছেলে ও মেয়ের খুব ভালো বন্ধু হয়ে উঠেছে তারও আর বাড়ি ফেরার কোন ইচ্ছা নেই এই করে বিয়ে সম্পন্ন হলো পরের দিন বউ বিদায় নেবে সবাই সেই কারণে তোড়জোড় করছে পরের দিন মেয়েকে সবাই বরণ করবে এমন সময় পিসিমা সেখানে উপস্থিত ছিলেন না সবাই তার খোঁজ নেন কিন্তু হঠাৎই একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

(ক্রমশ, পরবর্তী সংখ্যায় সমাপ্ত)

সায়ন্তিকা দাস,

চতুর্থ সেমিস্টার

অনুগল্প

মা

পৃথিবীর বুকে শত সংগ্রামচিত্তের প্রকৃষ্ট কান্ডারী তুমি "মা"। মানসিক কাঠ্যিন্যের ভিতর নিমজ্জিত তাঁর অপ্রকাশিত ভালোবাসা খালি চোখে প্রত্যক্ষ না হলেও অনুভূতির প্রতিটি পরশে থাকে মিশে।

-শোনো না,আজ স্কুলে কিছু বই লাগবে,নাইলে ক্লাসে বসতে দেবেনা!

-চল, যাওয়ার সময় কিনে নেব, কেমন।

-আজ অন্য কোনো সবজি করবে,একই সবজি তো অনেকদিন ধরে খাচ্ছি বলো!

-আচ্ছা বাবু,কাল বাজার থেকে মাংস আনব কেমন, খাবিতো?

একপ্রকার আনন্দে লাফিয়ে ওঠে ছোট্ট আবির।

- হ্যাঁ,খাবো।

- শোন,স্কুল থেকে ফিরে আলমারিটা খুলে দেখবি, তোর জন্য একটা গিফট আছে কেমন।

-সত্যি, কি আছে?

-এখন নয়,সময় হলে জানতে পারবি,এখন চল খেয়ে নে,স্কুল যাবিতো ?

ছোট্ট ছোট্ট পায়ে স্কুল যায় আবির।ফিরে এসে দৌড়ে যায় আলমারির কাছে।ওটা খুললেই চোখে পড়ে একটা চিঠি!তাতে লেখা:

প্রিয় আবির,

আজ বহুদিন পর হয়তো তুই চিঠিটা পাবি। তখন আমি তোকে ছেড়ে অনেক দূর চলে গেছি। দিনদিন এই করোনা আমায় দুর্বল করছে, হাতে বেশি সময় ও নেই। তোর যাতে কিছুনা হয় তাই তোকে মামারবাড়ি দিয়ে এসেছে তোর বাবা। ওই আমার একমাত্র ভরসা, তাছাড়া আর কেউ নেই বাবু। তোকে আমি খালি একটা কথা বলবো, আমাদের বিপদে আমরা পাশে কাউকে পাইনি, সব ছেড়ে চলে গিয়েছে তবে তুই সর্বদা মনে রাখিস,তোকে হতে হবে অনন্য। এদের থেকে অনেক

আলাদা। মানুষের বিপদে মানুষের মতো পাশে দাঁড়াস, তাদের সাহায্য করিস কেমন।

ইতি,

তোর মা,

চিঠিটা পড়ে চোখে জল এলো আবিরের। আজ তোর মা আর নেই, করোনায় মারা গিয়েছে বহুদিন আগে। এতদিন সে জানতো মা কাজের সূত্রে অন্য শহরে থাকে।

দূরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখে দিগন্ত ও চলে যাওয়ার সময় বলে গেছিলো, "দেখো, আবির যখন বড়ো হবে, সব বুঝতে শিখবে তখনই যেন ও সকল সত্য জানতে পারে আর ওকে মানুষের মত মানুষ করো কেমন"।

দিনশেষে এইভাবে পৃথিবীর সকল মা রয়ে যায় বাচ্চার পাশে, হয়তো জীবন্ত নয়তো বা নিঃশব্দে।

পিয়ালী দাস,

দ্বিতীয় সেমিষ্টার

অনুগল্প • ২

ফিরে পাওয়া

সুধা তার পুরাতন গত দুবছর আগে ফেলে যাওয়া সেই পড়ার ঘরটাতে এসে বসল। পুরানো বন্ধুদের দুজন হঠাৎ তাকে সেখানেদেখে একটু হতবাক হয় ,ও কাছে গিয়ে একটু কথা বলবার প্রচেষ্টা করে, কিন্তু ফলস্বরূপ কোনো উওর না পেয়ে ফিরে আসে, নিজেদের মধ্যে তাকে নিয়ে ওরা সমালোচনা করতে শুরু করে।সুধা আজ ভয়ে ,আনন্দে, লজ্জায় নিজের মধ্যে বারবার হাজারও প্রশ্নের জাল বুনছে।হাতের কাছে খুলে রাখা সাদা খাতা ও নীল পেনটা যেন তার কাছে আজ অপ্রয়োজনীয়।যেখানে সে পড়ার মাঝে বারবার আঁকে তার মনের অন্তরালের জমা সেই কিছু মূল্যবান ছবি,যা দিয়ে সে গত দুবছর এভাবেই তার আপন মানুষটাকে খুঁজে এসেছে। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দ, সুধা দরজার দিকে তাকায় গত ১৫মিনিট ধরে সে যেসব ভাবনা ,বলা যেতে পারে যাকে নিয়ে এত কল্পনা রচনা করছিল ,সে সয়ং এসে হাজির হয়েছে,সুধা মনের অন্তরালে কালবৈশাখী ঝড় যা তার বিচলিত মনকে আরও বিচলিত করে তুললো সেই দরজা খোলার শব্দ ও তার সেই একপলক দেখার মাধ্যমে।আনন্দ, ভয়, যন্ত্রণা তাকে আবার ও গ্রাস করে।রক্তিম একটু হতবাক হয় ও স্বভাবসিদ্ধ স্বরে বলে "আরে সুধা তুই হঠাৎ" ।সুধা স্মিত হেসে তার মাধ্যমিক এর রেজাল্টটা তার হাতে তুলে দেয়।মধুজা নামের মেয়েটি বলে ওঠে"স্যার আগের দিন হোমওয়াক টা বেশি ছিল আজ একটু কম দেবেন"। সেদিকে কান না দিয়ে রক্তিম মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগে।তারপর একটি মন্তব্য করে সুধাকে "ইংরাজিতে ভালোই হয়েছে দেখছি"! আরো ভালো করতে হবে।সুধা হাসে । রক্তিম বলে এখন কী কী বিষয় নিয়ে পড়েছে সে? সুধা সবগুলি ব্যক্ত করে। এই প্রথম গত দুবছর পর আবার কথা বলা। রক্তিম মানুষ টা কঠিন তবে তার মন টা বড়ই নরম ।তারপর শুরু হয় একাদশ ইংরেজি নাটক "Othello"। ঘড়িতে তখন সকাল ৯টা ১০নাটকের কিছু অংশ শেষ হতে রেনু বলে ওঠে স্যার "এইটুকু থাক না"আজ স্কুলে যাওয়ার আছে।রক্তিম তা শুনে সকলকেই ছুটি দিয়ে দেয়।"সুধা একটু দাঁড়াও "সুধা থমকে দাঁড়ায় সেই পুরনো স্মৃতি তাকে ভিড় করে আসে।রক্তিম কিছু বলার আগে সুধা বলে ওঠে "আজ নিজের জেদে এসেছি, পরদিন আবারও আসবো, দুবছর আগের মা ,বাবাকে ভয় পেয়ে চুপ থাকা সেই সুধা আমি আজ আর নেই।রক্তিম সুধা র মুখপানে চোখ রেখে তার হাতটা শক্ত করে ধরে শুধু একটাই কথা বলে"আমারা এবার মিলিব একই মনে একই প্রানে" সুধার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পরে যায়। যেন এগুলি তার দুবছরের জমানো যন্ত্রনা।

সুলগ্না দে,

দ্বিতীয় সেমিস্টার

আত্মীয়

রোজ সকালে বাজার থেকে ফিরে রমেনের দোকানের চা খাওয়াটা আমার একটা অভ্যাস হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিনের মতো আজ বাজার থেকে সবচেয়ে বড়ো কাতলা মাছ আর সবজি নিয়ে ফিরে সকলের খোস মেজাজে রমেনের দোকানের স্পেশাল চা তে একটা হাল্কা চুমুক দিয়ে হাতে থাকা পাউরুটিতে একটা কামড় বসাতে যাবে ঠিক সেই সময় চোখ পড়ল একটা ছেলের দিকে। রোগা লিকলিকে গায়ের রং ও জামাটি তার ময়লা। ছেলেটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জিভ নাড়ছে। বেশ কয়েকদিন না খেয়ে রয়েছে মনে হয় ।তাই লোভ দিচ্ছে আমার খাবারে ।হাঁক দিলাম-

"ওই ছেলে এইদিকে আয়!"

ছেলেটি ভীরু পায়ে আমার দিকে এগিয়ে এল। হয়তো ভাবছিল একটা চড় কষিয়ে দেব। আমি তার হাতে আমার পাউরুটিটা তুলে দিলাম। দোকানে পয়সা মিটিয়ে ফিরে এসে দেখি ছেলেটা সেখানে আর নেই। তবে তার হাতে থাকা লাট্টুটা রয়ে গেছে বসার টেবিলের উপর। প্রতিদান দিয়ে গেছে বলে মনে হয়। ছেলেটা নিশ্চয় রেলপথের পাশের বস্তির ছেলে হবে। সেই পথেই হাঁটা ধরলাম। হঠাৎ একটা জায়গায় গিয়ে আমার চোখটা আটকে গেল। ছেলেটি আমার দেওয়া পাউরুটিটা কয়েকটি গরিব ছেলে ও বৃদ্ধ,বৃদ্ধাদের ভাগ করে খাওয়াচ্ছে। চোখে জল চলে এল এই রকম এক অপূর্ব দৃশ্য দেখে। ছেলেটিকে ডাকলাম-

-"কে হয় এরা তোর?"

-"কেউ না তো!"

না এই মানুষগুলো লকডাউনে পুরোপুরি অসহায়। অধিকাংশ মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি করেই খায়। হাতে থাকা বড়ো কাতলা মাছ আর সবজির ব্যাগটা তুলে দিলাম তাদের হাতে।

বললাম-

"এই মাছটা আর সবজিগুলো পারলে খেও, আর না হলে বিক্রি করে সেই পয়সায় কিছু কিনে খেয়!"

হঠাৎ দেখলাম সেই ছেলেটা আমার সামনে এসে উপস্থিত। পুলকিত হয়ে সে বলল -

"কে হয় এরা আপনার?"

হাসতে হাসতে বললাম

-"আত্মীয়"

ছেলেটি বলল-"ওরাও তো তাহলে আমার আত্মীয়" । আত্মার সাথে আত্মার যোগাযোগ একেই বলে হয়তো। হয়তো ওরা কেউ নয় ।নাই বা হল। কিছুক্ষণের আত্মীয় তো বটে! তাদের খেয়াল রাখাটাও তো আমার কর্তব্য ।আজ মানুষগুলোর স্বস্তির হাসি দেখতে দেখতে বর্তমান পরিস্থিতির সমস্ত বেদনা ভুলে গেছিলাম। সবাই যদি সবার এমন আত্মীয় হত কেমন হতো?

পিয়ালী দাস,

দ্বিতীয় সেমিষ্টার

কবিতা

নিজের মত

গল্প লিখো তুমি আমি মহাকাশ পারি দেব

চাঁদের সাথে পা মিলিয়ে

পৃথিবী ঘুরে দেখব।

শুনেছি, গল্পের গরু গাছে ওঠে,

আমি না হয় কক্ষপথে হাঁটব।

বৃষ্টি ভেজা দিনে তাই

ব্যাঙের ছাতা খুঁজব।

তোমার লেখা গল্পে আমি,

হয়েছি বীরাঙ্গনা।

এমন সব কাজ করব

যা সকলের অজানা।

রামধনুর ওই সাত রঙ, কোথায় লুকিয়ে থাকে?

তারাদের কোলাহল কাকে যেন ডাকে!

সমুদ্দুরও তাকে দেখে গর্বে ফুলে উঠবে,

সাত রাজার মানিকেরা সব

সেদিন তাকে খুঁজবে।

তৃষা চক্রবর্তী,

ষষ্ঠ সেমিস্টার

তোমার ভাবে

কি আশ্চর্য তুমি সৌমিত্রবাবু, সবার উপরে করেছ জাদু!

খবর জুড়ে আজ শুধুই তুমি

কাগজের প্রতিটা পাতায়, শুধু তোমার ছবি।

ইঞ্জিরি খবরেও তুমি, শুধু তুমি

বাদ পড়েনি শহরের অলিগলি।

তোমায় নিয়ে পদযাত্রা, আর তোমার বুলি।

হয়তো এ শুধু ক্ষণিকের!

আবার সবাই ব্যস্ত হয়ে ভিড়ে যাবো নিজের কাজে।

তবে তুমি কিন্তু মনে থাকবে, সকল পথিকের।

কারণ যেই মানুষটা রোজ রিক্সা টানে, সেও যে দেখি তোমার শোঁকে কাঁদছে!

গল্ফগ্রিন থেকে রবীন্দ্র সদন, বেলাশেষের অন্তিম চলন।

শেষকৃত্যে ধ্বনিত হলো ,আমার দেহখানি তুলে ধরো।....

কেউ ভাবেনি তোমার বার্ধক্য।

সবার মধ্যেই কিন্তু জীবিত, সেই অপু-ক্ষিদ্দার কণ্ঠ।

তুমি নায়ক, তুমি কবি,

তুমি বাঙালীর মনে চিরজীবী।

তুমি নক্ষত্র, তুমি মাস্টারমশাই

তুমি অপরাজিত, তুমি উত্তমের চাইতে কম কি!

তুমি আজ পঁচাশী, তবুও দেখ্ছি ফেলুদা রূপেই তোমার কদর বেশি!

শুনেছি, তুমি নাকি চেয়েছিলে আজীবন ছবি করতে,মৃত্যু অবধি!

দেখো তাই হবে।

সত্যজিত বাবু ক্যামেরা ধরে, ঠিক তোমার দিকেই তাক করে,

এক দৃষ্টিতে রয়েছে চেয়ে

তোমার, এন্ট্রি শট নেবে বলে।...

প্রীতিষা মাইতি, চতুর্থ সেমিস্টার

শুটিং - এর অংশবিশেষ

জন্মভূমি

শ্বেত রঙ নীরাবতা,

নীলাভ দেয় কোমলতা ।

সবুজ দেয় প্রাণ,

কালোয় সবই ম্লান।।

দেশে ঢুকেছে জীবাণু,

মানুষ তবুও হয়নি কাবু।

জীবন হয়েছে নরক,

মানুষ আজ অপারগ।।

যারা এতদিন হয়েছে অত্যাচারিত,

তারাই আজ মুক্ত ।

নিজ দোষে বাড়ছে প্রকোপ,

এখনও দলে দলে বাড়ছে ক্ষোভ।।

থামেনি এখনো কাঁদা ছেটানো,

সুযোগ পেলেই কাজ শুরু খই ফোটানো ।

হায় রে 'জন্মভূমি' ,

কী মানুষদের ঠাঁই দিলে তুমি ।।

ঐশী সিংহ,

দ্বিতীয় সেমিস্টার

যুগলবন্দি

মিত্র যখন সত্য মাঝে
শ্রেষ্ঠতারই আসন খোঁজে,
অপু - মানিক জুটি বাঁধে,
জীবন পথের পাঁচালী মাঝে।

সৌমিত্র পথদৃপ্ত ,অপরাজিত বীর
চারুলতার অমল হয়ে
সত্যজিতের সৃষ্ট লয়ে
দেবীর রূপের বিসর্জনে উমা প্রসাদ সত্য কহে।

দুয়ে মিলে অভিযান এ
হীরক রাজার দেশে,
ফেলুনাথ - এর সোনার কেল্লা, তো
কভু জন অরণ্যে ; আগন্তুকের বেশে।

যেথায়, সত্য - মিত্র সংঘবদ্ধ
কাপুরুষ কভু আসে?
জন অরণ্যে গণশত্রু রা থাকে
মহাপুরুষের মুখোশে !

প্রদোষ যখন সানায় তার
মগোজাস্ত্রে ধার,
মুখোশ ধারী কুচক্রীদের
নিশ্চিত যেনো হার।

সুলগ্না দে,
দ্বিতীয় সেমিস্টার

তুমি তো সেই সুন্দরী

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কারোর প্রেমিকার হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কারোর মন সুন্দর হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কৃষ্ণের প্রেয়সীর হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কাউকে ভালোবাসতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কারোর রাত জাগার কারণ হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কারোর মন ব্যাকুল করতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা একজন লক্ষীমন্ত মেয়ের হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা কারোর গল্পের নায়িকার হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা একজন সাধারণ মেয়ের হতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা একজনের ভিড়ের মাঝে মিশতে লাগে।

তুমি ঠিক ততটাই সুন্দরী,

যতটা একজন ভালো বন্ধুর হতে লাগে।

মন্দিরা বসাক,

দ্বিতীয় সেমিস্টার

সত্য - জিতে বাঙালী

বাঙালী শুধু খাঁটিই বোঝে

ঝাঁঝালো সরষের তেল থেকে

পদ্মার ইলিশ মাছে।াইতো বাঙালির মন

আজও পড়ে আছে

"হীরক রাজার দেশে"।

কারা যেন চর্চায় রাখে,

বাঙালীর খাওয়া আর শোওয়া

তাই তো সত্যজিত রায়ের

"সোনার কেল্লা" খুঁজতে

রাজস্থান যাওয়া।

সঙ্গে নিলেন আরেক সঙ্গী

যেথায় চাই গোয়েন্দা ফন্দি

তাই তো ফেলুদা'র চাই

বাঙালী গোয়েন্দা হওয়া।

"অপুর সংসার" র অপু বেশে

নাম পেয়েছেন বহু দেশে।

লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসব শেষে

ব্রিটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট পুরস্কার এলো দেশে।

তাঁর প্রথম ছবিই চমকপ্রদ

"পথের পাঁচালী" তাই তো

হিউম্যান ডকুমেন্ট পুরস্কার স্বীকৃত।

অস্কার জয়ী প্রথম

ভারতীয় চলচ্চিত্র পরিচালক

সত্যজিৎ রায়ের নামেই তাই

বাঙালীর সিনেমার জগৎ সার্থক।

সাবনাম সেরিন,

চতুর্থ সেমিস্টার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বইয়ের জন্য সত্যজিৎ রায়ের করা প্রচ্ছদ

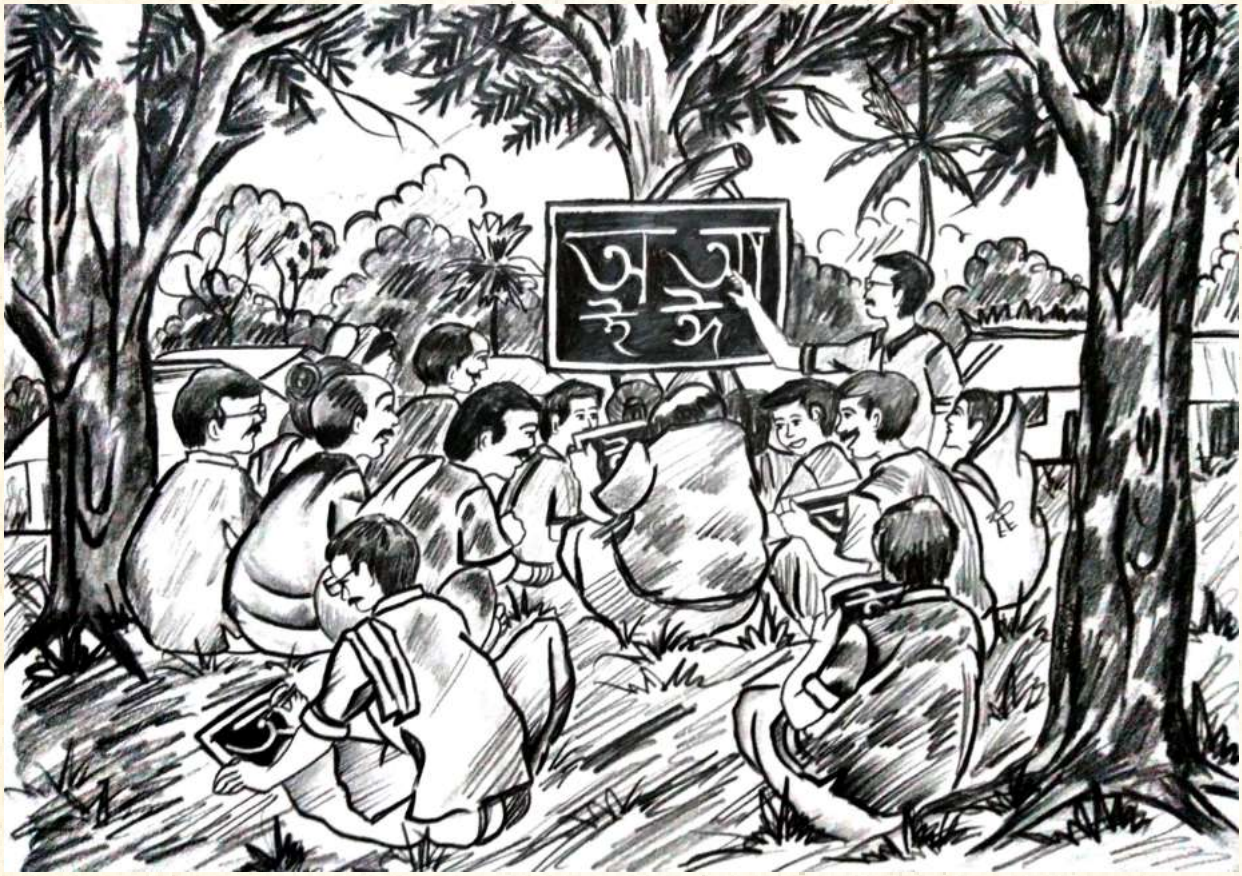

অয়ন্তিকা দেব,

দ্বিতীয় সেমিস্টার

ফটোগ্রাফি

এবার মরলে গাছ হবো

দেবীকা সাহা,

ষষ্ঠ সেমিস্টার (স্নাতক সাধারণ)

বন্দিত্বই ভবিতব্য

দেবীকা সাহা, ষষ্ঠ সেমিস্টার (স্নাতক সাধারণ)

আকাশে আজ রঙের বাহার

অঙ্কিতা রায়, ষষ্ঠ সেমিস্টার

আমার শহর ফুটপাতেও স্বপ্ন বোনে

তৃষা চক্রবর্তী, ষষ্ঠ সেমিস্টার

'আমার এ জটিল শহরে, আজও যে টিকে আছে '

প্রীতিষা মাইতি, চতুর্থ সেমিস্টার

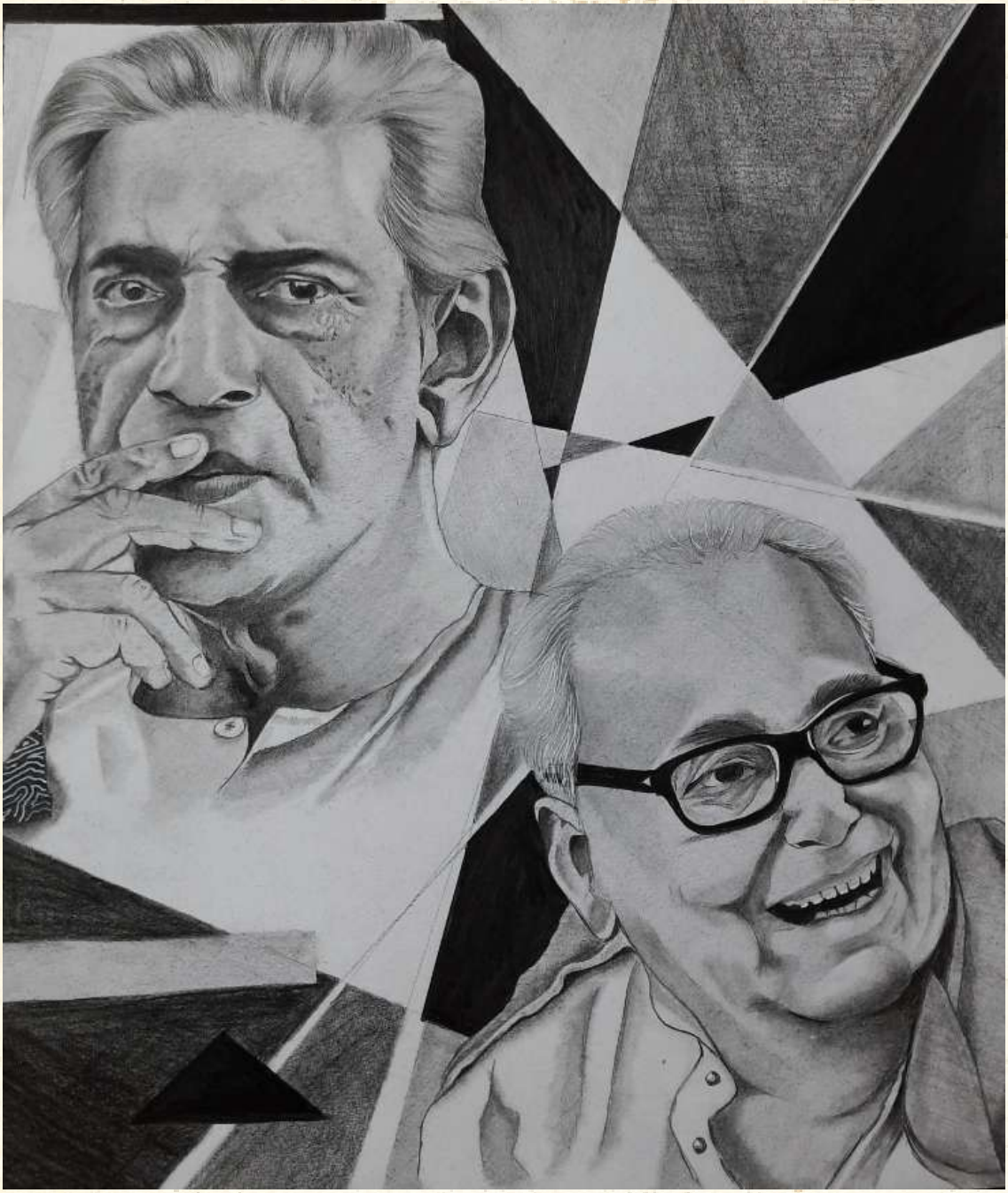

" তুমি রবে নীরবে, হৃদয়ে মম "

প্রিয়াঙ্কা পাল, ষষ্ঠ সেমিস্টার

সমাপ্ত